এখন শুধু পদক্ষেপ

চাণক্য সেন

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখ ১৩৭১

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

মুদ্রক :

জয়ন্ত বাকচি

পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড

১৯, গুলুওস্তাগর লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :

গৌতম রায়

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

রেপ

অ

সবে শুরু

আজ এখানে

অশোক উদ্ভিদ মাত্র

মন্ত্রী ও মেয়ে

আমি লিখতে বসেছি দুটি বিখ্যাত অখ্যাত সার্থক ব্যর্থ পুরুষের কাহিনী, যার সঙ্গে মিশে আছে অনেক অনেক অপচয়িত অঙ্গীকারের অলিখিত না-ইতিহাস, এবং একটা দেশ যার বুকের মধ্যে দুনিয়ার মানুষের সাত ভাগের একভাগ ল্যাপটা-ল্যাপটি ক'রে মৃত-জীবিত, জীবিত-মৃত, সৃষ্টির প্রথম বিস্মৃত প্রভাত থেকে, যে দেশটাকে ফা-হিয়েন থেকে ই. এম. ফস্টার, নায়পাল আর নীরদ চৌধুরী অত ভীষণভাবে জেনেও নাকি একেবারে বুঝতে পারে নি, অথচ যে দেশের ক্ষুধা, হ্যাঁ, শুধু জান্তব ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, একবার মুক্তি পেলে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করতে পারে। যে দুটি পুরুষের কাহিনী আমি লিখব তাদের কখনও মন্থর, কখনও নিশ্চল, কখনও ত্বরান্বিত জীবনের সঙ্গে মিশে আছে কোটি কোটি মানুষের পদধ্বনি ; ইতিহাস পরিহাস করলেও, যার চিহ্ন বহন ক'রে চলেছে এই দেশের প্রাচীন এবং এখনও কুমারী অক্ষয় মৃত্তিকা। বিচূর্ণ ভূগোলের বিভগ্ন সীমা-সীমান্ত লঙ্ঘন ক'রে আকাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর কোটি কোটি মানুষের কল্পিত পদধ্বনি একদা দুটি পুরুষের মধ্যে যে উত্তাপ সৃষ্টি ক'রেছিল, সময় ও জীবন নামক দুই দানবের মিলিত দস্যুতা আজ আর তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট রাখে নি। তবু হলফ ক'রে বলছি, তবু এই কোনও একদিনের লাল-আপেল হৃদয় দুটির বিশুষ্ক ন্যাতান নিঃশেষিত অবশিষ্টটুকুকে ছিঁড়ে ফেললে দেখতে পাবে এখনও এই এতটুকু এই এত্তটুকু, একটু ক্ষিধে। এককালে ক্ষুধা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বালিয়ে দেবার মত উগ্রচণ্ডী ছিল, তারপর বিকৃত

অজীর্ণ আহারের দাপটে নিবু নিবু হ'য়ে এল, কিন্তু, বিশ্বাস করো, নিভল না, যে ক্ষুধা নিভে যায়, মৃত্যুতে অথবা নির্বাণে, সে ক্ষুধা এ নয়। দুটি পুরুষের ক্ষুধা যখন একটা যুগের ক্ষুধার সঙ্গে মিশে যায় তখন যুগান্তর ছাড়া তার উপশম হতে পারে না।

যে দুটি পুরুষের কথা লিখব তাদের একজনকে তোমরা চেন, অন্তত জানো; আর একজন তোমাদের অপরিচিত। প্রথম ব্যক্তি আমি, আমি কে তা তোমরা কাহিনী পড়লেই বুঝবে, তোমাদের হৃদয়ে একই সঙ্গে ব্যথা ও ক্রোধের সঞ্চার হবে, তোমাদের চোখ জ্বলবে, বুক থেকে নির্গত হবে দীর্ঘশ্বাস, আমি জানি তোমরা আমাকে একই সঙ্গে ভালোবাসো ও ঘৃণা করো, মালা পরিয়ে দাও এবং তুচ্ছ করো, আমি তোমাদের কাছে একই সঙ্গে বীর ও কাপুরুষ, নির্ভীক আজন্ম পদাতিক ও শত্রু-চুম্বিত সার্থক পলাতক।

আমি তোমাদের কবি। তোমরা বলবে, ছিলে, কোনও একদিন তুমি ছিলে আমাদের কবি, এখন আর নও।

আমি মিনতি ক'রে বলব, এখনও, এখনও।

অন্য পুরুষটি, যাকে তোমরা চেন না, যার নামটা হয়ত তোমাদের মধ্যে বয়সে প্রবীণ ও মানসে স্থবির কারুর কারুর এখনও মনে প'ড়ে যাবে, তারও একটা কাহিনী আছে, যা অনেকখানি তোমাদেরই ইতিহাস, তোমরা যারা তাকে ভুলে গেছ এবং নিজেদেরকেও।

আমি তাকে সহসা দেখে চমকে উঠলাম এই কলকাতারই রাজপথে।

পৃথিবীর অনেক দেশ দেশান্তরে আমি যাবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু যেহেতু আমার নেই পর্যটকের স্বভাবজাত ঔৎসুক্য, তাই মনে নেই কোথায় দেখেছি কোন মন্দির হিন্দু অথবা বৌদ্ধ অথবা ক্রিশ্চিয়ান, কিংবা কোন ক্যানভাস অথবা ভাস্কর্য, লুভে কিংবা বৃটিশ মিউজিয়মে অথবা অজন্তা ইলোরায়; কিন্তু আমার মনে আছে সমুদ্র আর আকাশ আর বিস্তীর্ণ বনভূমি আর পাহাড় এবং মানুষ। আমি শুধু একটা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দেখতেই ভালোবাসি, এবং মানুষকে আমার মনে হয় প্রকৃতির

সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য। বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের মিছিল দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে, কত কত মানুষ, চলছে একা অথবা যুগলে অথবা যুথে, অনেক বিষয়েই তারা এক, যেমন সবাই দুপায়ে হাঁটে, কম বেশি একই রকম জামা-কাপড় পরে, একই খাদ্য আহার করে, বহু মানুষ এক ভাষায় এক শব্দে ব্যক্ত ক'রে নিজেদের চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি; তথাপি প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি আলাদা দ্বীপ, নিজের বৈশিষ্ট্যে স্বকীয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হোক না সে রাস্তা নিউ ইয়র্কে, প্যারিসে, লণ্ডনে, হংকং-এ, টোকিওতে, মস্কোতে অথবা দিল্লী বোম্বাই-হায়দরাবাদ কিংবা কলকাতায়, চলন্ত, জীবন্ত, বলন্ত মানুষ, ব'সে থাকা শুয়ে থাকা মানুষও দেখতে আমার দারুণ ভালো লাগে; আমি একটা ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করি জনসমুদ্র দেখতে পেলে; আমার রক্তের গতি এখনও, বিশ্বাস করো, হঠাৎ বেড়ে যায়; আমি যেন এক বিরাট সচেতন শক্তির প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি। এত, এত মানুষ, যারা প্রত্যেকে একক, কেউ কারুর ডবল নয়, এত মানুষকে কোন শক্তি একত্র ক'রে কোন লক্ষ্যের দিকে কি কৌশলে ধাবিত করছে ভাবতে আমার বড় বিস্ময় লাগে।

আমি মানুষের মিছিল দেখতে ভালোবাসি।

এখন আর ওদের কাউকে আমি চিনি না, ঐ যে ওরা সারি বেঁধে কলকাতার রাস্তায় চলেছে, হাতে লাল ঝাণ্ডা, এবং তুলে ধরেছে লাল নীল কালো রং-এ লেখা নানারকম দাবি, আর ছেঁড়া গলায় চীৎকার দিচ্ছে, চাই, চাই! মানব না, মানব না, মানব না!! চলবে না, চলবে না, চলবে না!!! আমার দেহ এখনও বার বার শিহরিত হয়। কেন না আমি এখনও জানি, মানুষ যে এত বড় সভ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছে, তার মূলে রয়েছে তার চাই-চাই দাবি, তার না-মেনে-নেওয়ার ইস্পাত শপথ, যা-চলে-আসছে-কিন্তু-চলা-উচিত-নয়, তাকে 'চলবে না' হুঙ্কার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাথুরে শক্তি।

মিছিলের মানুষদের এখন আর আমি চিনি না, একদিন চিনতাম,

অন্তত বিশ্বাস করতাম যে চিনি, তাই এখন, এই আমার পরিণত ঈষৎ-নেশা-ধরা জীবনে, মিছিল দেখতে দেখতে বার বার আমি খুঁজি অন্তত একটি মানুষকে, যাকে আমি চিনি, যার নাম আছে, ঠিকানা, পিতৃ পরিচয় আছে, যে আমার পরিচিত কোনও এক গৃহ থেকে প্রতিদিন বেরিয়ে আমার চেনা পথে হেঁটে অথবা যানবাহনে নিজের কর্মস্থলে হাজির হয়; সারা দিনের পরাজয়টুকু ট্যাকে গুঁজে একই পথে ফিরে আসে একই গৃহে কোনও এক নিঃশেষিত নারীর অবশিষ্ট মমতায়; যাকে আমি চিনি, কোনও উৎসুক বালকের অথবা উদাস যুবতীর দৃষ্টি ভেদ ক'রে আমি যাকে দেখতে পাই, চিনতে পারি এমন একটি মানুষ, যার একক জীবন শুকনো পাতার মত রিক্ত, যার একক চিত্তে আশার ক্ষীণতম প্রদীপও জ্বলে না, তাই বহু রিক্ত মানুষের মধ্যে শামিল হ'য়ে সে এক অজ্ঞাত অপরিচিত মহাশক্তির অন্বেষণে কিছুক্ষণের জন্যে নিজের ক্ষুদ্র সীমানা থেকে মুক্তি পেয়ে হঠাৎ জীয়ন্ত! তার দুর্বল বাহু কিসের জোরে হঠাৎ বায়ু ভেদ ক'রে উঁচিয়ে উঠল কোন অপরিচিত সংগ্রামের অব্যর্থ হাতিয়ার হ'য়ে? আজ এই মানুষটা কেউ নয়, একটা সামান্য দ্বিপদ জীব, কিন্তু একদিন এরই পদক্ষেপে কি কাঁপিবে মেদিনী, এরই হাতের মুঠোয় ধরা দেবে কোনও নিশ্চিত মঙ্গলের প্রতিশ্রুত ভবিষ্যৎ?

আমি এখন রাজপথে, জনপথে দাঁড়িয়ে মানুষের মিছিল দেখি, একটা মানুষকেও চিনি না, জানি না। আমি বছরের বেশির ভাগ ঘুরে বেড়াই মেহনতী সংগ্রামী মানুষের সন্ধানে। কায়রো, বাগদাদ, আলজিয়র্স, হাভানা, মস্কো, বুদাপেস্ট। কিন্তু আমার দেশের মিছিলে শামিল মানুষদের এখন আর আমি চিনি না।

তাই একদিন একটা মিছিলে একটা চেনা মুখ দেখে আমি ভীষণ চমকে উঠলাম।

আমার বুক কেঁপে উঠল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

মিছিলে একটি মুখ।

মিছিলে একটি মুখ।

মিছিলে একটি মুখ।

মিছিলে, আমার চেনা একটি মুখ। একটা মানুষ যে ভাঙা গলায় হুংকার ছাড়ছে 'মানব না, মানব না,' তাকে আমি চিনি; ভাবতেই আমার দেহ অবশ হয়ে এল।

অনেক দিনের অনেক অঙ্ক গুলিয়ে গেল আমার।

এ লোকটার মিছিলে শামিল হবার কথা নয়।

যেমন, আজ আর মিছিলে শামিল হবার কথা নয় আমার।

আমি লোকটার পিছু নিয়েছি। পিছু নিয়েছি আমারও। এই সেই পিছু নেবার কাহিনী।

॥ দুই ॥

নীলাচল ধরকে আমি প্রথম চিনতে পেরেছিলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে, এখন থেকে পুরো আটত্রিশ বছর আগে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাত্র বছর খানেক বয়স, যুদ্ধ তখনও য়ুরোপ, উত্তর আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার দাপটে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারতবর্ষের নাভিশ্বাস শুরু হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ চালের দাম সবে মাত্র লাফ দিয়ে উঁচু হ'তে লেগেছে। ভারতবাসীদের অনুমতি না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধের শরিক করে তোলার প্রতিবাদে সাতটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ ক'রেছে; সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে সংগ্রামী নীতি গ্রহণ করার অপরাধে কারাগারে বন্দী; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ইংরেজের সঙ্গে না করছে লড়াই, না সন্ধি। দিল্লীতে লর্ড ওয়াভেল আর কলকাতায় লর্ড ব্রাবোর্ন দিব্যি সুন্দর সাম্রাজ্য রক্ষা করে যাচ্ছেন, জবাহরলাল নেহেরু মাঝে মধ্যে সুন্দর সুন্দর বিবৃতি ছাড়ছেন। আর আমরা সদ্য স্কুল থেকে পাস করা এক অক্ষৌহিণী

তরুণ ছাত্র বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হ'য়ে ইংরেজের আশীর্বাদপুষ্ট ছোট বড় ভবিষ্যতের অনুমোদিত স্বপ্ন ভীরু বুকের মধ্যে ধিকি-ধিকি তুষের আগুনের মত পুষে রেখেছি।

সেকালে যারা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হ'তে পারত তাদের সামাজিক পরিচিতি এখনকার মত বিচিত্র-বিভিন্ন ছিল না। তাদের অধিকাংশ আসত উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের গৃহ থেকে, বাকীদের জনক ছিল বড় বড় ব্যারিস্টর, অ্যাডভোকেট, কলকাতাবাসী জমিদার, নামকরা ডাক্তার। আমাদের ক্লাসে মাত্র একটি বাঙালী ছাত্র এসেছিল ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এবং তিনটি মাড়োয়ারী পরিবার থেকে। চল্লিশটি ছাত্রের মধ্যে একটিও মফঃস্বল থেকে আসে নি, যদিও কলেজের অন্যান্য ক্লাসে মফঃস্বল থেকে আগত ছাত্র ছিল না তা নয়। আমরা চল্লিশজন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তারকা চিহ্নিত হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে সূর্য-চিহ্নিত ছিল নীলাচল ধর। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে প্রথম হয়েছিল। কলকাতা থেকে নয়। বঙ্গের দ্বিতীয় শহর ঢাকা থেকে।

একেবারে অবিকল তরুণ গৌরাঙ্গের মত দেখতে শারদীয় সংখ্যা 'যুগান্তরে' ছাপা গৌরাঙ্গের ছবির মত। রক্তাভ গৌরবর্ণ, মুখখানি চন্দ্রের মত গোলাকৃতি; চোখে, নাকে, চিবুকে মোলায়েম নরম লাজুক ব্যঞ্জনা; সরু ও সোজা দাঁতগুলির ওপরে পাতলা রক্তিম ওষ্ঠাধর; মাথায় কদমছাঁট পাতলা চুল। একবার তাকালেই বোঝা যায় শুধু ধনী পরিবারের ছেলে নয়, অভিজাত পরিবারের ভীষণ আদুরে দুলাল। এদের বকে যাওয়াই উচিত এবং কাম্য, কিন্তু নীলাচল ধর ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হওয়া তুখোড় মেধাবী ছেলে, অধ্যাপকরা পর্যন্ত তাকে সমীহ করে।

অভিজাত পরিবার তো বটেই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, পরের জন ঢাকার সেসন জজ, তৃতীয় জন ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল, বম্বে। চতুর্থ নীলাচল। মাঝখানে দুটি বোন, দুজনেই নামকরা সুন্দরী। পারিবারিক আভিজাত্য ও আর্থিক প্রাচুর্য

সত্ত্বেও নীলাচলের জীবনে একটা মস্ত বড় শূন্য ছিল। জন্মের তিন মাস আগে তার বাবা ম'রে গিয়েছিলেন। ঢাকার সবচেয়ে নাম করা অ্যাডভোকেট রায় বাহাদুর সদাশিব ধর কলকাতার সেসন্‌স্ কোর্টে জনৈক লক্ষপতি মাড়োয়ারীকে পত্নীহত্যার অভিযোগ থেকে বাঁচাবার জন্যে জবরদস্ত এক দারোগাকে জেরায় নাজেহাল করার মাঝখানে হঠাৎ হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গিয়ে তিন মিনিটে ম'রে গিয়েছিলেন। তার ফলে নীলাচল জন্ম থেকেই মাদাদাদিদিকাকাজ্যেঠাপিসিমাসিদের অজস্র ভালোবাসা ও সতর্ক আদরে শৈশব অতিক্রম ক'রে কৈশোর ছাড়িয়ে তারুণ্যে উপনীত হ'য়েছিল।

সদাশিব ধর ঢাকার রমনা অঞ্চলে নিজের মর্যাদা ও আয়ের উপযুক্ত বসতবাড়িতে বাস করতেন। কলকাতার তখনও-নতুন-পল্লী বালিগঞ্জের কাছাকাছি সাদার্ন অ্যাভিনিউতেও তিনি একটি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর সে বাড়িতেই বাস করতেন। আদরের-দুলাল মেধাবী ছোট ভাই নীলাচল, বলা বাহুল্য, বড়দাদার কাছে থেকেই আভিধানিক অর্থে মানুষ হচ্ছিল।

নীলাচল আর আমি খুব সহজেই বন্ধু হ'য়ে গিয়েছিলাম। গেজেটে আমার নামের সঙ্গেও একটি তারকা চিহ্ন ছিল। কিন্তু নীলাচল আর আমার মধ্যে আর কোনও মিল ছিল না। মদীয় পিতৃদেব বঙ্গ সরকারের পশু-পালন বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন, তাঁর নামের সঙ্গে তিনি সর্বদা বি-সি-এস লিখতেন। অবসর নেবার আগে সহৃদয় সরকার বাহাদুর তাঁকে 'রায় সাহেব' খেতাবে সম্মানিত করতে ভোলেন নি; বশংবদদের পুরস্কৃত করতে কোনও সরকারই কার্পণ্য করেন না। আমাদের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল, কিন্তু নীলাচলদের তুলনায় আমাদের গরীবই বলা যেত। সাদার্ন অ্যাভিনিউতে বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধরের বাড়ির ড্রয়িং রুমে আমি কোনওদিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঢুকতে পারি নি। নীলাচলের নিজস্ব ঘরখানায় যতক্ষণ বসে থেকেছি, ঈর্ষা নামক পিঁপড়ে আমার সর্বাঙ্গ দংশন করেছে।

তবু আমরা বন্ধু ছিলাম, গলাগলি বন্ধু না হ'লেও খুব কাছাকাছি বন্ধু। যদিও আমার গায়ের রং কালো, এবং আমি কুৎসিত না হ'লেও মোটেই সুদর্শন নই, আমার কুতকুতে চোখ, মোটা নাক, পুরু ঠোঁট, চোয়াড়ে চিবুক, এবং আমি বেমানান ঢ্যাঙা, ষোল বছর পূর্ণ হ'তেই পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি, তা ছাড়া আমি শব্দমান ও আনাড়ে, সুস্পষ্টভাবে অশালীন। বিপরীতের পারস্পরিক আকর্ষণই বোধ করি নীলাচল ও আমাকে নিকট ক'রে এনেছিল। ও, হ্যাঁ, আমাদের দু'জনের মধ্যে আরও একটা মিল ছিল, যদিও দুই অসম স্তরের মিল। নীলাচল তারুণ্যের প্রথম উত্তাপের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, বড় দাদার নির্দেশিত গৌরীশৃঙ্গ বিজয় করাটাকেই জীবনের একমাত্র কাম্য মনে ক'রে নিয়েছিল। অর্থাৎ কেউ তাকে 'তুমি বড় হ'য়ে কি হবে, প্রশ্ন করলে সে অবলীলাক্রমে উত্তর দিত : আই-সি-এস। আর আমাকে যদি কেউ ঐ একই প্রশ্ন করত, আমি বলতাম, বি, এ, পাস ক'রে বি, সি, এসটা দেব ভাবছি। আমরা দু'জনেই নিজেদের সামাজিক স্তরকে পেন্নাম ক'রে ইংরেজের ভারতসাম্রাজ্যে অনুগতের ভাগ্য ও বশংবদের ভবিষ্যৎ খুঁজে নেবার মহতী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের একই ক্লাসরুমে অধ্যাপকদের কাছে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ইতিহাস, রাজনীতি, ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্য এবং সংস্কৃত পড়ছিলাম। সবটুকু শক্তি বিনিয়োগ ক'রে নিয়মিত অধ্যয়ন অবশ্যি আমাদের কিছুই শেখাতে পারছিল না—আমরা বুঝতে পারি নি ভারতবর্ষ কি, কেন কখন অথবা কোথায়; পৃথিবীটাকে আমরা চিনতে পারি নি একটুকুও, রাজনীতির কোনও রহস্যই আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয় নি, ইংরিজী সাহিত্যের রস আমরা আস্বাদন করতে পারি নি, এবং পাণিনি ও কুমারসম্ভবমের শ্লোকগুলি ছাড়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে আমরা কিছুই আহরণ করতে পারি নি।

আমরা অবশ্যই জানতাম একটা বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ চলছে, যার অনির্বাণ ক্ষুধার আংশিক দাবি মেটাতে গিয়েও দরিদ্র ভারত আরও

নিঃস্ব হয়ে চলেছে; আমাদের কাছে ইংরেজ ও তার মিত্রদের লাঞ্ছিত ও কাহিল ক'রে দেবার জন্যেই হিটলার মস্ত হিরো। আমরা কংগ্রেসের যুদ্ধ বিরোধিতায় উৎসাহ পেতাম, কিন্তু উৎসাহে ভাঁটা পড়ত যখন দেখতাম কংগ্রেস বিপন্ন শত্রুর হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার কোনও চেষ্টা করছে না, শুধু সুচিন্তিত সুলিখিত বিবৃতি ও বক্তৃতায় ফ্যাসিবাদের নিন্দা ও মিত্রপক্ষের প্রতি সহানুভূতি উচ্চারণ ক'রে ইতিহাসকে দয়ালু হবার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছে। আমরা খুব ভালো ক'রেই জানতাম যে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম ও সবচেয়ে মূল্যবান উপনিবেশ। আমরা ইংরেজ সাহেবদের ভয়ানক ভয় এবং অনেকখানি সম্মান করতাম, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের প্রিয় ছিল না। বরং আমরা অপরিচ্ছন্ন চিন্তায় বৃটিশ শাসনের এখনি অবসান কামনা করতাম, এবং এ-ও চাইতাম যে আমাদের গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে, দেশের জনসাধারণ, ও তাদের নেতা কংগ্রেস, বৃটিশ শাসন হটিয়ে দিয়ে ভারতকে স্বাধীন ক'রে দিক। অবশ্য কোনও স্বদেশী শ্লোগান আমাদের কণ্ঠ থেকে শব্দময় প্রতিধ্বনি টেনে বার করতে পারত না।

তথাপি নীলাচল ও তাঁর পিতৃপ্রতিম বড়দাদা বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর এবং আমি ও আমার পিতৃদেব হবু-রায়সাহেব সুশীলকুমার মিত্রর মধ্যে কিছুটা প্রজন্ম ব্যবধান ছিল বৈ কি? নীলাচল স্বভাবতই স্বল্পবাক, বড়দাদার সঙ্গে সপ্তাহে তার চারটে শব্দ বিনিময় হ'ত কিনা সন্দেহ। তথাপি নীলাচল জানত সে কিছুতেই তার আই সি এস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ইংরেজ প্রীতিতে গদ্গদ হ'তে পারবে না। আমি দারুণ বকবক করলেও পিতৃদেবের কাছে খামস থাকাই শ্রেয় মনে করতাম, তার অন্যতম কারণ ছিল পশুপালন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেবের দগদগে ইংরেজ আনুগত্য। এদের একজনও স্বদেশ অপ্রেমী ছিলেন না, দু'জনেই ইচ্ছে করতেন ভারত স্বাধীন অথবা স্বয়ং শাসিত হোক, যে কারণে, ভারত স্বাধীন হবার পর দুজনের সেবাকেই কংগ্রেস

সরকার দেশের মঙ্গল, কল্যাণ, উন্নয়ন ইত্যাদির জন্যে উচিত কাঞ্চন মূল্য দিয়ে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধরের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল উদারমানস ইংরেজ নিজেই একদিন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। সুশীলকুমার মিত্র নিশ্চিত জানতেন নিজের স্বার্থেই ভারতকে অন্তত আরও পঁচিশ বছর ইংরেজের কাছে গণতন্ত্রে শিক্ষানবিশী থাকা উচিত। ১৯৪০ সালে দুজনের একজন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে সাত বছরের মধ্যে ইংরেজ ভারত ছেড়ে পালাবে।

ভাবতে পারে নি নীলাচল, পারি নি আমরা, পারেন নি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, পারে নি আমাদের পাড়ার পানের দোকানের চরণদাস।

না ভাবতে পারার মধ্যেই তিনটে বছর কেটে গেল, যার মধ্যে অনেক পিলে-চমকানো ঘটনা ঘটল পৃথিবীতে, যেমন হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ, সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্রপক্ষে যোগদান, পার্ল হারবার, আমেরিকার যুদ্ধে অবতরণ, এশিয়ায় বৃটিশ ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি একে একে জাপানের অধিকার করে নেওয়া। ভীষণ ভীষণ ঘটনা ঘটল ভারতবর্ষেও, যেমন জেল থেকে সুভাষ বসুর পলায়ন, মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে 'কুইট ইণ্ডিয়া' সংগ্রামের বন্যাপ্রবাহ, গান্ধীজি সহ সব কংগ্রেস নেতাদের অনায়াস কারাবরণ, এবং বঙ্গদেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ যাতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মরল ওয়াভেল ও মাউণ্টব্যাটেনের যুদ্ধ চালনার দাবি মেটাতে, এবং তাতে বাঙালী অথবা ভারতীয় মানসে সামান্যতম আলোড়ন দেখা গেল না, তা না হ'লে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নরহন্তা লর্ড ল্যুই মাউণ্টব্যাটেনকে আমাদের নেতারা সাদর নিমন্ত্রণে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদে বহাল করবেন কেন?

নীলাচল ধর এবং আমার জীবনেও কিছু কিছু হেড লাইন ঘটনা ঘটল। আই. এ. পরীক্ষায় নীলাচল প্রথম হল, আমি সপ্তম। নীলাচল বি. এ. পড়ার সময় ইতিহাসে অনার্স নিল, আমি একনমিক্সে। আমি

তো জন্ম থেকেই কবি—কিন্তু প্রথম প্রেমে পড়ে দারুণভাবে ঘায়েল না হ'লে অনেকগুলি কবিতা আমার একসঙ্গে লেখা হ'য়ে উঠত না, এবং তাদের কয়েকটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপাও নিশ্চয় হত না। আমাকে ঘায়েল করা কন্যাটি অবশ্য কবিতাগুলির পাঠ একটিও করল না, বি. এ. না প'ড়ে বিয়ে ক'রে বসল শিবপুর কলেজ থেকে সদ্য পাস এক ইঞ্জিনীয়রকে। নীলাচল আরও গম্ভীর হ'ল আরও স্বল্পবাক। আমার পিতৃদেব দিল্লীর মহাকরণে খাদ্য বিভাগের অ্যাসিস্টেণ্ট আণ্ডার সেক্রেটারী হ'য়ে চলে গেলেন, তাতে অবশ্য বঙ্গের দুর্ভিক্ষ একটুও কমল না, যদিও ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যদের জন্য খাদ্য সরবরাহ আরও জোরদার হ'ল। বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর একটি বিখ্যাত বিচারের রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, 'দেশ ও সম্রাট যখন শয়তানের চেয়েও দুষ্ট এক মহাশত্রুর সঙ্গে গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ভারত ও সাম্রাজ্য সরকারের দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে যারা দেশপ্রেমের ঝুটা বুলি আউড়িয়ে ফ্যাসি-বাদকে মদৎ যোগাতে পারে তাদের বিরুদ্ধে আইন কঠোরতম শাস্তি বিধান করতে বাধ্য। ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তারও চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমান মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তির বিজয়। বৃহৎ মঙ্গলের স্বার্থে ক্ষুদ্র আদর্শকে মাথা নত করতেই হবে। যারা এই সাধারণ সুনীতি মানতে রাজী নয় সুবিচার তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখাতে পারে না।' এই রায়ের শেষ বাক্যে বিচার-পতি মাননীয় নীলমাধব ধর আঠার বছরের একটি বালককে একটা লেটার বক্স-জখম করার অপরাধে নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ বহাল রেখে আসামীর পক্ষের আপীল ডিসমিস ক'রে দিলেন।

রায়টা, প্রত্যাশিতভাবেই, কলকাতার তৎকালীন ইংরেজ স্বার্থের মুখপাত্র একটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় চীৎকার ক'রে ছাপা হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজেও রায়টা কিছুটা উত্তেজিত গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছিল।

ইংরিজী পাস কোর্সের ক্লাসে পড়াতে এসে আমাদের তৎকালীন প্রিন্সিপাল যদিও নীলাচল ধরকে কংগ্রাচুলেট ক'রেছিলেন তাঁর স্বনামধন্য বিচারপতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'এনলাইটেড লয়ালটি টু দি ক্রাউনের' জন্যে, ইতিহাসের অনার্স ক্লাসের এক বিখ্যাত মার্কসবাদী অধ্যাপক গ্যারিবলডীর ঐতিহাসিক ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে সেকস্‌পীয়ারের জুলিয়াস সীজার থেকে উদ্ধৃতি ক'রে বলেছিলেন—So every bondman in his own hand bears/The power to cancel his captivity' এবং সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে যোগ করেছিলেন—except some High Court Judges.'

নীলাচলের গৌরবর্ণ মুখ লাল হ'য়ে গিয়েছিল।

আমরা বন্ধু, তাই নীলাচল ও আমি প্রায় রোজই বেশ খানিকটা সময় একসঙ্গে কাটাতাম, কিন্তু আমাদের খুব একটা বাক্যালাপ হ'ত না। কথা যা বলবার ব'লে যেতাম আমিই, নীলাচল কখন সখন মুখ খুলত। নিজের কথা সে প্রায় কখনই বলত না, যেটুকু কথা বলত তা পড়াশোনা বইপত্র নিয়ে। অনার্স ক্লাসের পর দু ঘণ্টা ক্লাস নেই, সাধারণত এ অবসরটা আমরা লাইব্রেরীতে খরচ করি। সেদিন নীলাচল লাইব্রেরীতে যেতে চাইল না, আমরা কলেজ স্কোয়ারে পুকুরধারে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি বকবক ক'রে উঠলাম, 'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালী' ছবিটার প্রশংসায়। আমাকে মাঝপথে খতম ক'রে দিল নীলাচল।

'বড়দার জাজমেণ্ট জঘন্য। আই অ্যাম অ্যাশেস্‌ড্‌ অব হিম।'

আমি বজ্রাঘাতে নিহত মানুষের মরা চোখে নীলাচলের মুখে তাকিয়ে রইলাম।

নীলাচল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্নার মধ্যেই ব'লে গেল, 'আমি জানি, আমি জানি। উনি নাইটহুড পেতে চান। কিন্তু বড় অন্যায়, বড় অন্যায়!' কথাগুলি বলল অবশ্য ইংরিজিতেই।

এ-ধরনের গুরুতর অনুভূতি ইংরিজি ছাড়া বাংলায় প্রকাশ করা যায় না। অন্তত ১৯৪৩ সালে সম্ভব ছিল না।

১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগেই নীলাচল ধর এবং আমি কমিউনিস্ট হ'য়ে গেলাম।

আমি নিজেকে বরাবরই বেশ চালাকচতুর মনে করতাম, সেই ১৯৪৩ সালেও। আদর্শের বাঁশি আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঝংকার তুলত না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মগজ নামক আমার এক নিরপেক্ষ ক্লিনিক ছিল, সেখানে আদর্শের সঙ্গে আমি বাস্তব পদার্থ সংযোগ ক'রে একটা সংকর কেমিকেল তৈরী ক'রে নিতে পারতাম। এবং পারতাম বলেই কমিউনিস্ট হ'য়েও আমি প্রথম থেকেই নিজের গা-বাঁচিয়ে চলার কলাকৌশলটা রপ্ত ক'রে নিলাম।

পারল না নীলাচল। আঠারো বছর বুঝি সে অপেক্ষা করছিল এক উত্তাল প্রবল তরঙ্গের জন্যে। সে তরঙ্গ এল, নীলাচলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আলবার্ট কাম্যু বলেছেন, দুনিয়ার অধিকাংশ বড় বড় ঘটনার জন্ম হয় খুব সাধারণভাবে। অঘটনাগুলিকেই ঢাক ঢোল পতাকা জৌলুস দিয়ে সংবর্ধনা করা হয়।

নীলাচলের জীবনে ১৯৪৩ সালে যে বিপ্লব এল (ভারতবর্ষে আজও এল না) তার জন্ম-পরিচয় এক ব্যক্তির একটি বক্তৃতা। রিপন কলেজে ইতিহাসের একটি নবীন অধ্যাপক ছিলেন। নাম হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ঈশান স্কলার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে নাকি এখনও রেকর্ড মার্কস। কমিউনিস্ট। হীরেন মুখার্জির বক্তৃতা শুনতে বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভিড় জমাত। তখন, সেই ১৯৪৩ সালে, ছাত্রছাত্রীরা অন্তত দুচারজন অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনবার জন্যে আগ্রহে অধীর হ'ত।

নীলাচলই প্রস্তাবটা রাখল, 'একটা বক্তৃতা শুনতে যাবি ?'

'কার বক্তৃতা ?' আমার তেমন উৎসাহ ছিল না।

'রিপন কলেজে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি বলছেন মার্কসিজম সম্বন্ধে।'

মার্কসিজম্ তখন খুব চালু আইডিয়া ছাত্র ও যুবক মহলে। আমাদের একজনেরও মার্কসিজম সম্বন্ধে বিশেষ কোনও জ্ঞান বা ধারণা ছিল না।

আকর্ষণ কিছুটা ছিল, একালে যেমন অনেকেরই মারকুজের টোটাল রেভলিউশন সম্বন্ধে আকর্ষণ আছে।

দুজনে বিজ্ঞাপিত ক্লাসরুমে হাজির হ'য়ে দেখি দাঁড়াবার স্থান নেই। এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের বক্তৃতা গা-ঠাসা-ঠাসি একপাল যুবকযুবতী রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেল। শুধু কয়েকটা কাশি ও একটা হাঁচি ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

বক্তৃতা শেষ হবার পর নীলাচল ও আমি রিপন কলেজ থেকে পায়ে হেঁটে বালিগঞ্জ এলাম। নীলাচল ট্রামে বাসে চড়তে রাজী হল না। সারা পথ হুঁম্ হ্যাঁ ছাড়া তার গলা থেকে শব্দ বেরুল না। আমার স্বভাবজ বকবকানিও হঠাৎ দেখলাম ঠাণ্ডা-জমাট হ'য়ে গেল। বাড়ির কাছাকাছি এসে নীলাচল প্রথম মুখ খুলল।

'মার্কস-লেনিন-স্তালিনের বইগুলো কোথায় পাওয়া যায় জানিস?'

আমি না-জেনেও বললাম, 'কলেজ স্ট্রীটে ঘুরলেই পাওয়া যাবে।'

'গভর্নমেণ্ট ব্যান্ ক'রে রাখে নি?'

আমি বললাম, 'কমিউনিস্টরা তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিত্র এখন। গভর্নমেণ্ট সি-পি-আইকে পর্যন্ত আইনী পার্টি করে দিয়েছে। বইটই নিশ্চয় আর নিষিদ্ধ নেই।'

নীলাচল চোখ রাঙিয়ে ব'লে উঠল, 'কমিউনিস্টরা বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বন্ধু নয়, হ'তে পারে না। তারা লড়ছে হিটলারের নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে। সোভিয়েট রাশিয়া যদি বেঁচে না থাকে তাহলে পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের আর রইল কি? এতক্ষণ ধ'রে বক্তৃতা শুনলে, আর এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলে না?'

পেরেছিলাম, কিন্তু নীলাচলের মত অমন গভীরভাবে পারি নি।

তিন মাস পরে নীলাচল ধর সোজা কমিউনিস্ট পার্টির আপিসে

গিয়ে হাজির। যে মধ্যম স্তরের নেতা তার সঙ্গে কথা বললেন, নীলাচল তার কাছে নিজের পারিবারিক পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছি। বি. এ. পরীক্ষায়ও সম্ভবত প্রথম হব। আমার বড়দা ঠিক ক'রে রেখেছেন আমি বিলেত যেতে না পারলে অন্তত দেরাদুন আই-সি-এস হব। আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমাকে কাজ দিন।'

অভিজাত পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন-ছেলেকে শ্রেণী ত্যাগ ক'রে সর্বহারাদের সঙ্গে শামিল হ'তে দেখতে কমিউনিস্ট নেতাদের সেকালে বড়ই আনন্দ হত। এখনও হয়।

মাঝারি স্তরের নেতা বললেন, 'তুমি ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন। তুমি ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে শুরু করো। তোমার মত ছেলে পেলে আমাদের ছাত্রফ্রণ্ট জোরাল হবে।'

নীলাচল বলল, 'না। আমি মধ্যবিত্তদের মধ্যে কাজ করতে চাই নে। আমি চাই শ্রমিক অথবা কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে। আপনারা যা আদেশ করবেন আমি তাই করব। কিন্তু ট্রেডইউনিয়নে অথবা কৃষক সভায় কাজ করতে পারলে আমার বিশেষ আনন্দ হবে।'

পার্টির আদেশে নীলাচল অবশ্য ছাত্র ফেডারেশনেই হাতেখড়ি নিল। 'জনযুদ্ধে'র যুগে তাকে ছাত্র ফেডারেশনের ছোটখাট নেতা হ'তে দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজে অনেক বিদ্রূপ-সূচক মন্তব্য শোনা গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরোক্ষ বংশানুজ জনৈক যুবকও তখন আমাদের কলেজের ছাত্র ছিল। সবাই জানত সে বি. এ. পাস ক'রে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হবে এবং সুযোগ ও সময় মত একাধারে সক্ষম আইনজীবী ও অন্যাধারে কংগ্রেসী নেতা হবে। এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে, একদিন রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতার শিখরে আসন দখল ক'রে বিখ্যাত হবে। সেই তরুণটি প্রকাশ্যে বলতে লাগল, বিচারপতি নীলমাধব ধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরেজের হ'য়ে 'জনযুদ্ধ' করবে না তো করবে কে? ১৯৪৩ সালের শেষদিকে এক সন্ধ্যায় একা বাড়ি

ফেরার পথে একদল দেশপ্রেমিক যুবকের হাতে নিদারুণ মার খেল নীলাচল। হাজরা পার্কে সে 'জনযুদ্ধ' বিক্রি করতে গিয়েছিল, বেশি বিক্রি হয় নি, অবিক্রীত পত্রিকাগুলি বগলদাবা ক'রে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরছিল। স্বদেশপ্রেমীরা তাকে বেদম প্রহার ক'রে তার সামনেই 'জনযুদ্ধ' পত্রিকাগুলির বনফায়ার করল। রক্তাক্ত জামা-কাপড় নিয়েই নীলাচল বাড়ি ফিরে গেল। মা-বৌদিকে বলল, একদল ছেলের সঙ্গে মারামারি হ'য়েছে, বড়দাদাকে যেন তাঁরা না জানান। এই ঘটনার এক মাস পরে পার্টির নির্দেশে নীলাচল খিদিরপুরে ডক-শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করল। তার প্রধান কাজ ছিল ডক-শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখান ও কমিউনিজমের অ-আ-ক-খ বুঝিয়ে দেওয়া। দারুণ উৎসাহে নীলাচল কাজ করে যেতে লাগল। বাড়ির অভিভাবকরা তার অনেক-রাত-ক'রে ঘরে ফেরা নিয়ে উদ্বিগ্ন হ'লেও কমিউনিস্ট কীর্তিকলাপের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেন নি। তাঁদের মনে সন্দেহ এল যখন নীলাচল ১৯৪৪ সালে অনার্স পরীক্ষায় দুই নম্বরের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস পেল না।

বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর একটু খোঁজখবর করতেই ছোট ভাইয়ের কীর্তি-কাহিনী টের পেয়ে গেলেন। নীলাচলের ডাক পড়ল বড়দাদার লাইব্রেরীতে।

বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর ছোটখাট, অতিশয় ফর্সা, পুরো টাকমাথা, অসম্ভব রাশভারী মানুষ। চশমার পুরু কাচের মধ্য দিয়ে তিনি বোধ হয় এই প্রথম নীলাচলকে পুরোপুরি দেখলেন। চুরুটে টান দিয়ে নাসিকা মাধ্যমে ধোঁওয়া ত্যাগ ক'রে তিনি জানতে চাইলেন :

'পরীক্ষায় খারাপ করলে কেন ?'

নীলাচল উত্তর দিল, 'ভালো পড়া হয় নি।'

'হয় নি কেন ?'

নীলাচল নীরব রইল।

'কি ক'রে হবে ?' বিচারপতি ফেটে পড়লেন এবার, 'হবে কি

ক'রে ? ছি ছি, ছি ছি, তুমি ভিড়লে গিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ? যারা সব কিছু ধ্বংস করতে চায়, ঈশ্বর মানে না, ধর্ম মানে না, স্ত্রীলোকের সতীত্ব মানে না, এমন কি যাদের দেশপ্রেম পর্যন্ত নেই, তাদের সঙ্গে ? তুমি ভুলে গেলে কোন পরিবারের সন্তান তুমি, কি তোমার বংশগত ও জাতিগত ঐতিহ্য, তোমার পিতৃদেব কি ছিলেন, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কে ? একবার ভেবে দেখলে না এর পরিণতি কি ? তুমি কি সর্বহারা ? তুমি কারখানার মজুর, না স্কুলের মাস্টার, না তুমি আধা-উপোসী চাষী ? নিজের সর্বনাশ কি কেউ ক'রে এমনভাবে নিজের হাতে ? পরিবারের নাম ডোবায় ? ছি ছি ছি ছি।'

নীলাচলকে আনত মস্তকে তাঁর খেদ ও তিরস্কার গ্রহণ করতে দেখে বিচারপতি নীলমাধব ধর এবার তাঁর রায় ঘোষণা করলেন, 'যা হবার তা হ'য়ে গেছে, যা হারিয়েছ তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এবার ওসব কুসংসর্গ ত্যাগ করো। মন দিয়ে এম. এ টা পড়লে আবার তুমি ফার্স্ট হবেই। যুদ্ধ শেষ হলেই আবার বিলেতে গিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার পথ খুলে যাবে। আমি একটু চেষ্টা করলে তোমার পুলিশ রিপোর্টে কালো দাগ মুছিয়ে দিতে পারব। মনে রেখো, আই-সি-এস ছাড়া তোমার আর কোনও রাস্তা নেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার। যা মুখচোরা তুমি, বারে যোগ দিয়ে তোমার কিছু লাভ হবে না। যদি ভেবে থাক বৃটিশ এম্পায়ার যুদ্ধের পরে আর থাকবে না, তাহলে খুব বোকা ভুল করছ। চার্চিল তো বলে দিয়েছেন, এম্পায়ার ভেঙে দেবার জন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন নি। ইংরেজ এদেশে আছে, থাকবে, এবং সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

অত মূল্যবান কথাগুলি নীলাচল আনত মস্তকে নীরবে শুনল দেখতে পেয়ে বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হলেন, এবং, আর একবার চুরট টেনে, আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে ক'রে, হুকুম দিলেন :

'তুমি এখন যেতে পারো। আর যেন না শুনতে পাই তুমি

কমিউনিস্টদের কাছাকাছিও আছ। ভেবো না আমি খবর পাব না। আই. জি. কে বলে রেখেছি তোমার সম্বন্ধে যে সব রিপোর্ট আছে, আমাকে জানাতে।'

মাথা নিচু ক'রে নীলাচল বড়দাদার লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন নীলাচল রাত্রিতে বাড়ি ফিরল না।

পার্টির নেতারা ওকে একটি পার্টি মেসে পাঠিয়ে দিলেন। কর্মীরা নিজেদের মধ্যে এই মেসগুলিকে 'কমিউন' বলত।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনী জীবন যাপনের অনুমতি দেন। তার আগে সি-পি-আই ছিল বে-আইনী পার্টি, কর্মীদের অজ্ঞাতবাসে থেকেই কাজকর্ম করতে হত। পার্টি ফ্রণ্ট-গুলি অবশ্য বেআইনী ছিল না। যে সব কমিউনিস্টরা ট্রেডইউনিয়ন, কিষাণ সভা, ছাত্র ফেডারেশন ইত্যাদি ফ্রণ্টে কাজ করত তারা খোলা সড়কে বিচরণ করত। আসল পার্টি কর্মীদের কাজ করতে হ'ত 'মাটির নিচে'।

১৯৪৪ সালে যদিও পার্টি নিষিদ্ধ ছিল না, তথাপি নেতারা জানতেন আইনী জীবন দীর্ঘস্থায়ী হবে না, অন্তত না-ও হ'তে পারে। অতএব পার্টির একটা অংশ 'মাটির নিচেই' রেখে দেওয়া হল। আর একটা অংশ খোলাখুলি কাজে নিযুক্ত হল।

নীলাচলকে যে 'কমিউনে' থাকতে দেওয়া হল সেটা পার্টির খোলা-জীবন কর্মীদের কয়েকটি আবাস-স্থানের একটি। অধিকাংশই কাজ করে পার্টি জার্নালে, ট্রেডইউনিয়নে অথবা ছাত্র ফেডারেশনে। সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের পুরুষ, অধিকাংশের বয়স বাইশ থেকে বত্রিশ, যাঁরা মধ্যবয়সী তাঁরা অদূর অতীতে কোন এক বা অন্য সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিন দশকের শেষের দিকে জেলজীবনে কমিউনিস্ট হ'য়েছেন।

নীলাচল চারদিন 'কমিউন' থেকে দিনে রাত্রে একবারও বার হল

না। শুধু লেনিন আর স্তালিন পড়ল, আর পার্টির কথা শুনল। পঞ্চম দিনে এক উঁচু স্তরের নেতা 'কমিউনে' এলে নীলাচল অনুরোধ জানাল তাকে 'মাটির নিচে'র পার্টিতে কাজ করতে দেওয়া হোক।

নেতা কারণ জানতে চাইলে নীলাচল বলল, 'রাস্তায় হোক, কলেজে হোক, ডকে হোক যেখানে আমার বড়দাদার লোকেরা আমাকে দেখবে, পাকড়াও করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখে দেবে।'

নেতা গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তুমি এখন মেধাবী ছেলে, পড়াশোনা করবে না? আমরা চাই আমাদের ক্যাডাররা উচ্চশিক্ষিত হোক।

নীলাচল বলল, 'আমি শ্রমিক আর কৃষকদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হ'য়ে যেতে চাই।'

পার্টির নেতারা নীলাচলকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাডার ক'রে নিতে রাজী হলেন না।

নীলাচল একদিন আমাকে বলেছিল, 'আমাকে ততখানি বিশ্বাস করার তাদের কারণ ছিল না। আমি যে পুলিশের লোক নই এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন নি।'

এক সপ্তাহ পরে নীলাচল কলেজে গেল। কলেজ মানে বিশ্ববিদ্যালয়। [দ্বি]তীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সত্যি একজন পুলিশ অফিসর তাকে [পা]কড়াও ক'রে লালবাজারে নিয়ে এল। একটা ঘরে তাকে চেয়ারে [ব]সিয়ে রেখে অফিসরটি ওপরিওয়ালার কাছে রিপোর্ট করল, আধ [ঘণ্]টা পরে সে নীলাচলকে নিয়ে একটা জীপ গাড়িতে চাপল, আঠার [মি]নিটে জীপটা নীলাচলদের বালীগঞ্জের বাড়ির ফাটকে ঢুকল। বড়দাদা [বা]ড়িতেই ছিলেন। অফিসর তাঁকে স্যালুট ক'রে বিদায় নিল। [নী]লাচলের বিধবা মা এবং সধবা বড় বৌদি দুজনেই কাঁদলেন। তিন [ভা]ই পো এবং দুই ভাই ঝি ভয়ে ও বিস্ময়ে তাকে দেখতে লাগল। [নী]লাচল দেখল বড়দাদার নিজস্ব প্রহরী তার পায়ের কাছাকাছি লেগে [র]য়েছে। শুনতে পেল বড়দাদা তাকে হুকুম দিচ্ছেন, 'দেখো, খোকা [যে]ন আবার ওদের খপ্পরে না পড়ে।'

আমি আর নীলাচল একই সঙ্গে কমিউনিস্ট হ'য়েছিলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে অমন বড় প্রভঞ্জন তৈরী হ'তে পারে নি। তার কারণ, প্রথমত, নীলাচলের মত আমি প্রথম থেকেই পার্টির সঙ্গে একাত্ম হ'তে চাই নি। কিছুটা দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলেছি। দ্বিতীয়ত আমার পিতৃদেব দিল্লী চলে যাবার দরুন আমি হার্ডিঞ্জ হস্টেলে আবাস নিয়ে প্রায় পরিপূর্ণ স্বয়ংশাসিত। আগেই বলেছি, আমার কবিতা লেখার অভ্যেস ছিল; প্রথম ব্যর্থ প্রেমের আর্ত উত্তাপ আমাকে কবিত্বে স্নাতক ক'রে দিয়েছিল, এবার বিশ্বের সর্বহারাদের শৃঙ্খলমুক্ত করবার আদর্শ ও উদ্দীপনায় আমি স্নাতকোত্তর হ'য়ে গেলাম। আমার বিপ্লবী কবিতা পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত ছাপা হ'তে লাগল; মুখে মুখে অসম্ভব তাড়াতাড়ি কবিতাগুলির আবৃত্তি শোনা গেল, আমি বি. এ. পাস করবার আগেই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কমরেড' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের দ্বারা কলেজে কলেজে বিক্রীত হ'তে লাগল। ১৯৪০ সালে কলকাতা তথা বঙ্গদেশের কমিউনিস্টদের প্রায় সব কিছুই ছিল। শুধু একটি কবি ছিল না। সুকান্ত ভট্টাচার্য তখনও আবিষ্কৃত হয় নি, অতএব এক শূন্য ভূমিকায় আমি অভিনয়ের যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অতি সহজে মনোনীত হ'য়ে গেলাম। এবং ফ্যাসীবিরোধী লেখক সঙ্ঘের একটি যৌথ নেতৃত্বপদও আমার জন্যে বরাদ্দ হ'য়ে গেল। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়ার প্রপাগাণ্ডা অফিসে চাকরি করছেন, এবং শ্রেণী সচেতন মার্কসবাদী উপন্যাস লিখছেন, সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত মদ্যপানে তাঁর পিলেও পচে উঠছে, এবং আমি এক একটি কবিতায় এক একটি বিপ্লবী লক্ষ্যভেদ করছি।

কমরেড, নবযুগের আর নেই বেশি দেরি
আলো ঝলমল প্রভাত যে সম্মুখে।
লাল ঝাণ্ডা নিয়ে এসে পড় তাড়াতাড়ি
ঝাঁপিয়ে পড় দানব শত্রুর বুকে।

অথবা :

প্রিয়, মালা পরবার দিন নয় অদ্য
বিপ্লবের মুখোমুখি আমরা
অস্ত্র দিয়েছে লেনিনের গদ্য
পলাতক যত সব ভোমরা।

এবং :

তবে, আজ বিজয়ের যুদ্ধ।
রাজশক্তির অনুকম্পার মুখে লাথ,
প্রজাজনের পেটে না পড়ুক ভাত,
তবু তারা একসঙ্গে চোখ রাঙায়,
বন্দরে বন্দরে কাজ বন্ধ
সাম্রাজ্যের পথ অবরুদ্ধ।
ভীত ঈশ্বরের বুক দুরু দুরু
বাজে লাল পদাতিক ডম্বরু।

তোমাদের ভীষণ ভুল হবে যদি ভেবে ব'সে থাকো সর্বহারাদের মুক্তিসংগ্রামে আমার ঐকান্তিকতা, আগ্রহ এবং প্রত্যয় নীলাচলের চেয়ে কম ছিল। কিংবা তোমাদের বা অন্য কারুর চেয়ে ঘাটতি ছিল আমার অনুপ্রেরণা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম অধ্যায়ে আমি, আরও অনেকের মতো ধারাল সমাজচেতনা অর্জন করতে পেরেছিলাম। নীলাচল ও আমি (এবং আরও অনেকে) বুঝতে পেরেছিলাম বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য এবার অস্ত যেতে বসেছে। পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী ধুরন্ধর মানুষকে বোকা বানিয়ে সোভিয়েট দেশ হিটলারের অমিতবিক্রম 'অপরাজেয়' সেনাবাহিনীকে তিন বছর ধ'রে ধ্বংস ক'রে তখন নিশ্চিত বিজয়ের গৌরবান্বিত লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পরিবর্তনমুখী যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারা যে বদলাবে তাতে ১৯৪৪ সালে অনেকেরই কোনও সন্দেহ ছিল না। বদলে কি হবে, ক্ষমতার সিংহভাগ যাবে কাদের দখলে, তাই ছিল আসল ও প্রধান প্রধান প্রশ্ন। ইংরেজ কতখানি ক্ষমতা ছেড়ে কতখানি কি কৌশলে

হাতে রাখতে পারবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, আপোসে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা কব্জা করতে পারবে, না কি ভারতকে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করে তবে মালিকদের শ্রেণীশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাছে তাই ছিল প্রধান সমস্যা। আমরা কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদ থেকে বিছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম প্রথম থেকেই, আমাদের সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে ইংরেজ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। অথচ আমাদের নিজেদের এমন কোনও জোর ছিল না যা দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিকে আমরা আকাঙ্ক্ষিত পথে চালিয়ে নিতে পারি। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ও প্রধান সমস্যা ছিল, হায়রে হায় আজও রয়ে গেছে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক, কেন না এই শ্রেণীর একটা বড় অংশের সহযোগিতা না পেলে আমাদের রাজনৈতিক অগ্রসর সম্ভব ছিল না, এখনও, আমার মতে, সম্ভব নয়। অথচ ১৯৪৪ সালে জাতীয়তাবাদের মুখ্য স্রোত থেকে কমিউনিস্ট বিচ্ছিন্নতা আমাদের মধ্যে একটা বিপ্লবী রোমান্টিকতার মানসিকতা তৈরী ক'রে দিয়েছিল, যে মানসিকতা অকমিউনিস্ট অথচ বিপ্লবী রূপান্তরের রঙিন স্বপ্নে প্রলুব্ধ তরুণ সমাজের একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

আমি ছিলাম সেই বিপ্লবী রোমান্টিকতার কবি।

আমার কবিতায় হাতুড়ি ও কাস্তে গান গেয়ে উঠত, শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না প্রতি নিশ্বাসে মানুষকে লজ্জা দিত, আমি বিপ্লবী ধ্বংসের বার্তা শুনতে পেতাম, আমার কবিতা মৃত্যুর ভয়ে ভীতদের যুদ্ধের সজ্জা পরাত। কৃষাণ মজুরদের শরণ নিত আমার কবিতা, তারা ছাড়া আর যে গতি নেই, তাই আমার কবিতায় তারা ও আমরা অভিন্ন দল, কৃষাণ মজুর আমাদের টেনে নিয়ে যাবে লাল প্রত্যূষের পথে। আমার কবিতা বাঙালী মধ্যবিত্তের দৈহিক স্থূলতা ও মানসিক জড়তাকে চাবুক মারত, যে মধ্যবিত্ত অহিংসা আর অসহযোগিতা মেনে নিয়েছিল, যার সাহিত্যে অল্পবিস্তর চিরস্থায়ী সখ, যে সবকিছুর মধ্যে নিমীল নয়নে স্থির ও সুন্দরকে দেখতে চায়, এবং যে চল্লিশ দশকের

মাঝখানে কংগ্রেসকে রাজত্বে মনোনীত করতে প্রস্তুত হ'য়ে দিন গুণছিল। এই মধ্যবিত্তের কাছে আমার কবিতা লেনিন দিবসে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভার বার্তা নিয়ে আসত, যে সভার হুংকার শুনে, আমার কবিতায়, মাড়োয়ারী ইষ্টমন্ত্র জপ করত, ধনতন্ত্রের উঠত নাভিশ্বাস, হাতুড়ি বিদ্যুৎগতি লাভ করত, এবং আমি শুনতে পেতাম হাজরা পার্কে আগামী কাল আবার জনসভার সংবাদ শ্রবণে শতশত জরাগ্রস্ত কণ্ঠ থেকে নাদিত হচ্ছে নিরপেক্ষতা বর্জনের প্রতিজ্ঞা। আমার কবিতায় লাল ত্রাসে কাঁপত গ্লেসিয়ার দিন। উচ্চারিত ক্ষোভে, বিস্ফোরক দিনে ছাত্র আর মজুরের মিছিল বাঞ্ছিত বিপ্লব ঘোষণা ক'রে যেত।

যে-বিপ্লবের চিহ্নমাত্র ছিল না বাস্তব পরিস্থিতিতে এই সুজলা সুফলা দুর্ভিক্ষশ্যামলা প্রাচীন ভারতবর্ষে।

এবার তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ কেন আমি অপেক্ষাকৃত অনায়াসে অল্প বয়সে সুখ্যাত হ'য়ে গেলাম, আর নীলাচল ধর চাপা পড়ল বাস্তব ভারতবর্ষের জাঁতাকলে, যেখানে, শত শত লাল পাখা সত্বেও আমার কবিতা পৌঁছতে পারে নি। আমার কবিতা যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বসল, বিজ্ঞপ্তি দিল, প্রজাপুঞ্জের স্বপ্ন ভেঙেছে, কারখানায় কাজ বন্ধ, ইতিহাস আমাদের পক্ষে আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে কেঁপে উঠছে উদাসীন ঈশ্বর, কিন্তু নীলাচল ধর বিচারপতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার দেহরক্ষীদ্বারা রক্ষিত হয়ে কলেজ আর বাড়ির মধ্যে বন্দী হ'য়ে রইল দিনের পর দিন, এবং একদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল, কংগ্রেসী নেতারা কারামুক্ত হ'য়ে ইংরেজ আর মুসলিম লীগের সঙ্গে সলাপরামর্শে বসলেন। কলকাতা শহরে হিন্দু মুসলমানের রক্তের স্রোত বইল। দেশ ভাগ হল। জন্ম নিল স্বাধীন ভারতবর্ষ এবং স্বাধীন পাকিস্তান। তামাটে বণিকদের মুখে হাসি। কারখানায় পুরোদমে কাজ। জমিদারদের সুদিন। প্রজাপুঞ্জ সুষুপ্ত বিধাতার ঘাড়ে ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে প্রাচীন পর্বতের মত উদাসীন। অগ্নিবর্ণ সংগ্রাম শুধু দেওয়াল-লেখনী আর সড়কের চিৎকারে নিঃশেষিত।

নিঃশেষিত হ'তে নীলাচলের বেশি সময় লাগল না।

আমি অনেক, অনেক সময় পেয়ে গেলাম। রোমান্টিকতা সহজে নিঃশেষ হবার নয়।

নীলাচল ধর আরও কিছুদিন ল'ড়ে গেল। যে আমার কবিতার মুগ্ধ, ভক্ত পাঠক ছিল।

বিচারপতি মাননীয় নীলমাধব ধর একদিন প্রভাতে আবিষ্কার করলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুনরায় পলাতক। কলকাতার পুলিশ নীলাচলের খোঁজ পেল না।

পাবে কি করে? পার্টির নেতাদের অনুমতি নিয়ে নীলাচল বোম্বাই শহরে পালিয়ে গেল। বোম্বাইএর শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কিছু কাজকর্ম ছিল। নীলাচল এবার আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যাডার হ'য়ে বোম্বাই ডক শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হল।

'জনযুদ্ধে'র লাইন অনুসরণ ক'রে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত পার্টি বুর্জোয়া জাতীয়বাদী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল। ১৯৪৫-৪৬ সালে পার্টিকে আক্রমণ ক'রে বসল আর একটা বদ-হজমী লাইন যাকে মার্কসীয় পরিভাষায় বলা হয় ইয়ালটা তেহ্‌রান লাইন, অথবা মার্কিন কমিউনিস্ট নেতা ব্রাউডারের নামে, ব্রাউডারিজম। যার মূল বক্তব্য ছিল: যুদ্ধোত্তর দুনিয়াকে নতুন ক'রে একসঙ্গে গড়বে বিজয়ের দুই প্রধান নেতা সোভিয়েত যুনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অতএব ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে চলতে হবে একই সঙ্গে একসাথে এবং ছন্দমধুর প্রতিযোগিতায়। এই লাইন্‌ অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের পার্টি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেম করতে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল প্রেমে কংগ্রেসী নেতাদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তারপর ১৯৪৭ সালে হঠাৎ বেধে গেল শীতল যুদ্ধ। তার দুবছর আগে যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই, বৃটেনের জনসাধারণ উইনস্টন চার্চিলকে রাজনৈতিক বনবাসে পাঠিয়েছিল, এবং সরকার তুলে দিয়েছিল লেবার পার্টির হাতে। ১৯৪৬ সালের ৫ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসৌরি রাজ্যে ফুলটন শহরে

ওয়েস্টমিনিস্টর কলেজে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের উপস্থিতিতে চার্চিল শীতল যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বললেন, 'বলটিকের স্টেটেন থেকে আড্রিয়াটিকের ট্রিয়েস্ট পর্যন্ত নেমে এসেছে, সারা য়ুরোপের বক্ষ ভেদ ক'রে, এক লৌহ যবনিকা, অধিকর্তা বৃটেন।' বছরখানেকের মধ্যে স্তালিন প্রত্যাঘাত ক'রে 'কমিনফর্মে'র মাধ্যমে সোভিয়েত ও পূর্ব-য়ুরোপকে একজোট করলেন। পৃথিবী দুই শীতল-যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হল।

রক্তারক্তি হাহাকার বিভজনের মধ্য দিয়ে ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতার মধ্যে বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যে কোনও পরিবর্তন দেখতে পেলেন না কমরেড স্তালিন। গান্ধী, নেহরু, জিন্না, লিয়াকত আলি খান তাঁর চোখে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পিছু চলা কুকুরের বেশি কিছু নয়। তখন নিয়ম ছিল বিশ্বের সব কমিউনিস্ট শুধু কমরেড স্তালিনের চোখে দুনিয়ার তামাম বাস্তবকে দেখবে, কমরেড স্তালিনের মন নিয়ে ভাববে, কমরেড স্তালিনের নির্দেশিত অথবা অনুমোদিত পথে চলবে। অতএব ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকারের সঙ্গে আমাদের পার্টি আড়ি ক'রেই বসল না, ১৯৪৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে শহরে নগরে গণঅভ্যুত্থানের আহ্বান দিয়ে বসল। অভ্যুত্থান নিশ্চয় হল না কোথাও, কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটল কোনও কোনও শহরে। পার্টি আবার বেআইনী ঘোষিত হল। শুধু তাই নয়, পার্টির নেতাদের মধ্যেই মত ও পথ নিয়ে গুরুতর মতভেদ ও দ্বন্দ্ব দেখা দিল। পুরো কলকাতা কংগ্রেসটাই হ'য়েছিল মাটির নিচে। নেহরু-প্যাটেলের পুলিশ ইংরেজের পুলিশের চেয়ে কোনও অংশে কম ধুরন্ধর ও অত্যাচারী ছিল না, ইংরেজের পুলিশ-কোড পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার, এবং সাম্রাজ্য রক্ষায় যে সব পুলিশ অফিসর সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদের নেতৃত্বেই তৈরী হয়েছিল, হচ্ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষের অনেক বৃহত্তর ও শক্তিধর পুলিশবাহিনী।

'গোপন' পার্টি কংগ্রেসের অনেকখানিই দিল্লী কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগ জেনে গিয়েছিল।

আবার অনেক কিছু জানতেও পারে নি।

যেমন জানতে পারে নি নীলাচল ধর বোম্বাই থেকে অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই চলে এসেছিল কলকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধি হ'য়ে।

আমি কিন্তু প্রতিনিধি হ'তে পারি নি। চাইও নি প্রতিনিধি হ'তে।

আমার কবিতা তখন, সেই কাল্পনিক অগ্নিগর্ভ দিনগুলোয়, বহু দূরের রক্তিম প্রভাতকে দুঃসাহসে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে বঙ্গবাসীর পায়ের কাছে হাজির করেছিল।

আমার কবিতা কংগ্রেসীদের পনেরই আগস্টকে অধিকার করে নিতে উদাত্ত আহ্বান ছুঁড়েছিল ছাত্র-যুবক-চাষী-মজুরদের, তাদের গলায় গর্জে তুলেছিল বজ্রের আওয়াজ।

না হয় আজ হেরে গেলাম, আমার কবিতা লিখেছিল, আমরা ফের আসব পনেরই আগস্ট, আবার জ্বলব, ঘা দিয়ে ভাঙব শিকল, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে, নিশ্চয় খুঁজে বার করব।

আমার কবিতা লাখো লাখো মানুষদের ডাক দিয়ে বলেছিল, স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! দোকানে কবাট লাগাও, দপ্তরের চাবি আর যানবাহনের চাকা বন্ধ করো, বিজলীর চোখ অন্ধ করো, অন্ধ করো চৌরঙ্গীকে।

আমার কবিতা দুর্বার বিদ্রোহে দেয়ালে দেয়ালে শেষ লড়াই ঘোষণা করেছিল, দেখতে পেয়েছিল দুঃশাসনের ভিৎ দিকে দিকে ভেঙে পড়ছে, হুঙ্কার দিয়েছিল, রক্তের ঋণও শুধব রক্তে, লাখো লাখো হাত এক হলে পরোয়া করার কে আছে, কে রোখে আমাদের দাবি আমাদের লাল ঝাণ্ডাকে?

আমার কবিতা চিৎকার ক'রে উঠেছিল, ভাইরে, ভাইসবরে, দিন এসে গেছে, রক্তের বদলে রক্ত দেবার দিন এসে গেছে, বিদেশীরাজের প্রাণ-ভোমরাকে নখে নখে টিপে মারবার দিন এসে গেছে, লাঙ্গলের ফালে আগাছা উপড়ে দেখবার দিন এসে গেছে, কাস্তের মুখে নতুন লাল ফসল তুলবার দিন এসে গেছে, ভাইরে, ভাইসবরে।

ভাইরা, ভাইসবরা পড়ে নি আমার কবিতা, তারা মাঠে, বন্দরে, কারখানায় পায়ের ঘাম মাথায় তুলে স্বাধীন ভারতবর্ষের কংগ্রেস রাজত্বকে পাকাপোক্ত ক'রে দিচ্ছিল, পনেরই আগস্ট কব্জা ক'রে নিশ্চিন্ত বৈভবে বিরাজ করছিল গান্ধীটুপি দেশসেবকরা। কিন্তু তারা আমার কবিতার বিপ্লবী অগ্নিস্রোতকে রুখতে পারে নি।

১৯৪৮ সালেই, কলকাতা কংগ্রেসের দিন কয়েক পরে নীলাচলের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেল এক পার্টি-বন্ধুর বাড়িতে।

আমি অবাক হ'য়ে নীলাচলকে দেখলাম। সোনার রং পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চেহারায় আর সেই বালীগঞ্জ বড়লোকী কমনীয়তা নেই, কেমন একটা ধারাল-ধারাল ভাব। নীলাচলের মুখচ্ছবিতে জ্বলন্ত বিভ্রান্তি।

পার্টি-বন্ধু কলকাতার স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার। তাঁর দুটি সুন্দরী সপ্রতিভ কন্যাও পার্টি দরদী।

'জাস্টিসদা তোমার কলকাতা আগমনের খবর পান নি?' পার্টি-বন্ধুর প্রশ্ন।

'তাঁর খবর আমি রাখব কি করে?' নীলাচলের জবাব।

'তোমরা কিন্তু বন্ধ গলিতে আটকা পড়ছ,' পার্টি-বন্ধুর মন্তব্য, 'আমি অবশ্যি সামান্যই জানি, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি তোমরা হলুসিনেসন নামক ব্যাধিতে ভুগছ। দেশের কোথাও বিপ্লবের নামগন্ধ নেই। দেশের মানুষেরা বরং চাইছে নেহেরু শান্তিতে রাজত্ব করুন। তোমরা গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছ, গণই বা কোথায়, অভ্যুত্থানই বা কোথায়?'

নীলাচল ম্লান হেসে বলল, 'ঐ তো আমাদেব কবি বসে আছে। ওকে প্রশ্ন করুন। ও তো পাড়ায় পাড়ায় অগ্নিকোণ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে।'

আমি বললাম, 'কবিদের কল্পনার সীমারেখা নেই। আমি জানতাম না যে আমার কবিতার ওপর নির্ভর ক'রে তোমরা পলিটিক্যাল রিপোর্ট তৈরী করো।'

নীলাচল এবার একটা গুরুতর নান্দিক ও তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলল। 'কবির কল্পনা সত্যি বলগাহীন। তোমরা অবাধ-বিচরণের লাইসেন্স নিয়ে জন্মেছ, তোমাদের কল্পনার গতি কোনও পুলিশের সাধ্য নেই রোধ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত কবি, অবাস্তবকে বাস্তব ব'লে উপস্থিত করতে পারে কিনা। অর্থাৎ তোমার কবিতা পড়ে মানুষ যদি ভেবে বসে বিপ্লব এসে গেছে এবং মনে করে যে তুমি পার্টির দৃষ্টি নিয়েই কবিতা লিখছ, তাহ'লে ব্যাপারটা বেশ গুরুতর হয়ে পড়ে।

আমি বলে উঠলাম, 'আমি পার্টির কবি নই। সে স্বীকৃতি পার্টি আমাকে দেয় নি।'

নীলাচল বলল, 'লোকের ধারণা, পার্টির মানসিকতাই তোমার কবিতার প্রধান উৎস।'

আমি বললাম, 'পার্টির নির্দেশে আমি কবিতা লিখি না। লিখি নিজের প্রাণের উত্তাপে। আমার কবিতার জন্যে আমাকে কোনদিন পার্টির প্রাদেশিক কমিটির কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।'

নীলাচল রেগে গেল। বলল, 'হ'তে পারে। তুমি যদি লিখে বসো, ব্যারাকে ব্যারাকে সেনারা বিদ্রোহ করছে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ক'রে তারা জনতার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী পায়ের অগ্রগতির শব্দে মেদিনী কেঁপে উঠছে, কারখানা দখল ক'রে নিচ্ছে শ্রমিকরা, জ্বলে-যাওয়া মাঠে মাঠে বসন্ত জেগে উঠছে, তাহলে অন্তত লোকেরা ভাববে তুমি পার্টির মানসিকতাকেই কবিতায় প্রকাশ করছ। এবং পার্টির এক সময় প্রয়োজন হ'তে পারে জনসাধারণকে জানিয়ে দেবার যে তোমার কবিতা ও পার্টি-মানসিকতার মধ্যে কোনও মিল নেই।'

নীলাচলের কণ্ঠে বিষ দেখতে পেয়ে ব্যারিস্টার পার্টি-বন্ধু আলোচনাটাকে বাড়তে দিলেন না। তিনি কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করলেন, যেমন সর্দার প্যাটেল যদি সত্যি সতর্ক থাকতেন গান্ধীজি নাথুরাম গোদসের গুলিতে মারা পড়তেন না, অথবা, অনেকে

বলছে মহম্মদ আলি জিন্না ক্যানসারে ভুগছেন, এবং ইন্দিরা গান্ধী ও ফিরোজ গান্ধীর মধ্যে বনিবনা নেই।

আমি নীলাচলের ক্রুদ্ধ হুমকিতে একটুও ভয় পেলাম না, বরং মজা পেলাম। প্রথমত, পার্টির মধ্যে নীলাচল চুনোপুঁটি, আমাদের কাছে তার স্থান যাই হোক না কেন; দ্বিতীয়ত, যে-পার্টি নিজেই পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সে নিশ্চয় শাসন করবে না তার একমাত্র কবিকে, আর অন্য কেউ না জানলেও আমি তো জানি যে পার্টির কাছে 'কমরেড কবি'-র (অর্থাৎ আমার) যতটা দাম, আমার কাছে পার্টির দাম ঠিক ততটাই, তার চেয়ে বেশি নয়, কম নয়। অতএব নীলাচলকে বলতে দেওয়া যেতে পারে, যা সে বলতে চায়।

ইতিমধ্যে, ব্যারিস্টার মহাশয়ের দুই রূপসী কন্যা ঠিক ক'রে উঠতে পারল না কে বেশি রোমান্টিক হিরো—অভিজাত পরিবারের ভুখোড় মেধাবী পুত্র, বর্তমানে বিপ্লবের আদর্শের জন্য সর্বত্যাগী নীলাচল ধর, না চলতি-যুগের সেরা বিপ্লবী কবি, আমি! তারা তাদের সবটুকু দৈহিক-আত্মিক-মান্দিক সৌরভসম্পদ সমবেত ক'রেও নীলাচলের বিষণ্ন, অনেক সময় আর্ত, চিন্তা-নিমগ্নতার বর্ম ভেদ করতে না পেরে অবশেষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, সুধীন দত্তের ও জীবনানন্দ দাসের কবিতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেণী-সচেতন' উপন্যাস এবং আরও নানাবিধ সাংস্কৃতিক সম্ভারে এবং তাদের নিজস্ব দৈহিক দৌলতে আমাকেই আকৃষ্ট করতে উদ্যোগী হল। আমার শরীরে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে টের পেলাম যে প্রক্রিয়াটা সবচেয়ে প্রবল, তার নাম আতঙ্ক।

ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে না বললে তোমরা এ যুগের লোকেরা ঠিক বুঝবে না। চল্লিশ দশকে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে ছেলেমেয়েদের মেশামিশি খুব সংকীর্ণ ছিল। স্কটিস-প্রমুখ মাত্র দু'একটি কলেজে ছিল কো-এডুকেশন, কিন্তু মেয়েরা ক্লাসে ঢুকত অধ্যাপকদের সঙ্গে, বসত নির্ধারিত লেডীজ সীটে, এবং অধ্যাপক বেরিয়ে যাবার আগেই ঘটে যেত তাদের সমবেত প্রস্থান। মেয়েদের কমনরুমের সামনে ছেলেদের

ভিড়। বিশ্ববিদ্যালয়েও চিরকুট পাঠিয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে হত ছাত্রদের। রেস্তোরাঁয়, পার্কে, লেকে, গঙ্গার ধারে ছেলেমেয়েদের মেশামেশি ছিল না তা নয়, বাঙালী চিরদিনই একটু বেশি হৃদয়প্রবণ ও প্রেমিক, তখনও ছেলেমেয়েরা দুমদাম্ প্রেমে পড়ত, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস, কবিতা ইত্যাদিই ছিল প্রেমের প্রধান প্রকাশ। যে বঙ্গপুঙ্গব ছাত্র একটি ছাত্রীকে বগলদাবা ক'রে রাস্তা পার হ'তে পারত সে হ'য়ে উঠত শত শত বঞ্চিত ক্ষুধার্ত ছাত্রের ঈর্ষা ও নিন্দার পাত্র। বাংলা কথা-সাহিত্যে চল্লিশ দশকে রিফিউজি মেয়েদের আবির্ভাব ঠিক শুরু হয় নি, তার জন্যে লেখকরা আরও ক'বছর সময় নিয়েছিলেন, অতএব বলা যেতে পারে চল্লিশ দশকে বাঙালী যুব মানসিকতায় যুবতীদের প্রত্যক্ষ উৎপাতটা বেশ সীমিতই ছিল।

এই নিয়মের সাংঘাতিক ব্যতিক্রম ঘটত বালীগঞ্জের অভিজাত সমাজে। কমিউনিস্ট পার্টির উত্তাপে যাদের শৃঙ্খল প্রথম ভাঙল তারা মাঠ-কারখানার সর্বহারা নয়, অভিজাত উচ্চশিক্ষিত উদারচিত্ত বালীগঞ্জী বাঙালী সমাজের অগ্রসর যুবতী। এরাই এগিয়ে এল নতুন সাংস্কৃতিক তরঙ্গ নিয়ে : গান, নাচ, নাটক, এসবের মাধ্যমে যে পরিবর্তনের বাতাবরণ তৈরি করা যায় তার পথিকৃৎ এরাই। এদেরই উদ্যোগে মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যারাও প্রগতি-সংস্কৃতির নিশান হাতে নিল।

আমার মতো যারা বালীগঞ্জী যুবক নয়, তারা এই সব পথিকৃৎ কন্যাদের বিস্ময়, ভক্তি, ও আতঙ্কের সঙ্গে দেখতাম, কিছুতেই এদের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারতাম না। মনে আছে, ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের এক সাপ্তাহিক সান্ধ্য বৈঠকের পর, পার্টি-দরদী এক অসামান্য রূপবতী এম. এ. পাঠরতা কন্যাকে রাস্তার ওপরে পান-বিড়ির দোকান থেকে ডাব কিনে, ফুটো ডাব থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়েই জলটুকু পান করতে দেখে আমি বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, আতঙ্কে ও প্রেমে প্রায় মূর্ছা যেতে বসেছিলাম। আমি তখন নীতিগতভাবে প্রেমের কবিতা লিখতাম না, ও ধরনের বুর্জোয়া যৌন বিলাস প্রশ্রয় পেত

না আমার কাছে, কিন্তু, মনে আছে, যখনই শ্রমিক, চাষী, ছাত্র, নিষিদ্ধ ইস্তাহার, বারুদ, ষড়যন্ত্র, মিছিল, হরতাল, সভা, সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে কবিতা লিখতে বসতাম তখনই সেই সুন্দর ডাব-চুম্বিত মুখখানা আমাকে আক্রমণ ক'রে বসত। আমি আতঙ্কিত হ'য়ে অনুভব করতাম আমার কবি-এবং-পুরুষ সত্তাকে বিভক্ত ক'রে দেবার একটা চক্রান্ত তখনই শুরু হয়ে গেছে : আমাকে একই সঙ্গে আকর্ষণ করছে দুটি বিপরীত সমান্তরাল শক্তি : তরঙ্গিত সমুদ্রের স্বপ্ন, আর মিছিলের মুখ। সমুদ্র মানে কি, হাঁ? সমুদ্র মানে কি উচ্চাশা? তরঙ্গ মানে কি নারীর যৌবন?

নীলাচলের অবস্থা ছিল অন্যরকম। তার দৃষ্টি তখনও কোনও কন্যা আকর্ষণ করতে পারে নি। তার প্রথম প্রেম পার্টির সঙ্গে, প্রথম দৃষ্টির প্রেম। এবং নীলাচলের কাছে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পার্টি, সবকিছুই এক বিরাট বিমূর্ত ঐতিহাসিক শক্তি। সে শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে নীলাচল পেতে চেয়েছিল চল্লিশ দশকের বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের শূন্যতা থেকে মুক্তি। তার কাছে অন্য কোনও কিছুর তেমন কোনও আকর্ষণ ছিল না। জন্মের আগেই সে বাপ হারিয়েছিল। তার মা তার জন্মকে সুখ বা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি। তার বাপের মৃত্যুর জন্যে তাকেই দায়ী মনে করেছিল আত্মীয়স্বজনেরা। জীবনে তার যত্ন-আত্তির অভাব হয় নি, কিন্তু সকলের সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখেই নীলাচল বড় হয়েছিল। বাল্যকাল থেকে তার চেতনাকে আঁকড়ে ধ'রেছিল একটা অপরাধী-ভাব, গিল্‌ট্‌-কম্‌প্লেক্‌স্; নিজেকে বাবার মৃত্যুর জন্যে দোষী মনে করার যন্ত্রণা। দাদা-বৌদি-দিদিদের সঙ্গে তার কোনও নিবিড় আত্মীয়তা গ'ড়ে ওঠে নি। ছোটবেলা থেকেই নীলাচল গম্ভীর, স্বল্পবাক, চিন্তাশীল, মেধাবী। অন্তরঙ্গ বন্ধুও তার ছিল না কেউ। আমিই বোধহয় ছিলাম তার নিকটতম বন্ধু, কিন্তু আমার কাছেও নীলাচলের অনেককিছু ছিল অজানা। কোনও মেয়ের সঙ্গে ভাব হয় নি নীলাচলের। মেয়েদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব। অথচ সে লাজুক অথবা মুখচোরা ছিল না। যখন

কথা বলত তার ভাষা, আমরা অবাক প্রশংসায় শুনতাম, স্বচ্ছ, সন্নিবদ্ধ এবং সপ্রতিভ থাকত। প্রয়োজনে বসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনও নালাচলের জিভ আটকে যেত না, মুখ রাঙা হত না। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিতর্ক সভায় যোগ দিলে সে নির্ঘাত প্রথম হত। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও দু'বার প্রথম হ'য়ে সোনার মেডেল পেয়েছিল। সভা-সমিতি অথবা পাঠচক্রে ভাষণ দেবার সময় তার মধ্যে কোনও আড়ষ্টতা দেখা যেত না। আমরা ছাত্ররা একত্র হ'য়ে খিস্তিখাউড় করলে নীলাচলের কান অথবা মেজাজ গরম হ'ত না। সে শুধু নির্বিকার থাকত।

অনেক মানুষের ভালোবাসার জন্যে ভূষিত ছিল নীলাচল। অনেক মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে সে প্রতীক্ষা করছিল।

পার্টি এবং কমিউনিজম নীলাচলকে বহু মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। পার্টিকে আলিঙ্গন ক'রে নীলাচল আর একা ছিল না। সে হ'য়ে গিয়েছিল দুনিয়ার সর্বহারাদের বন্ধু। তাদের মুক্তি সংগ্রামের একলব্য সৈনিক। কমিউনিজমই এ যুগে একমাত্র রসায়ন যা এককে বহুর সঙ্গে আদর্শের, স্বপ্নিত ভবিষ্যতের রেশমী সুতোয় সংযুক্ত করে। ধনতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষকে শুধু যে মুক্তি দেয় তাই নয়, তাকে এনে দেয় এক সংগ্রামী ভূমিকা, নতুন কিছু নির্মাণের উত্তাপে তাকে বড় এবং মহান ক'রে তোলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা কোনও দিন এক লাখের বেশি বাড়তে পারে নি, এখন তো তার চেয়েও অনেক কম, কিন্তু এই তো সেদিন এক মহিলা সাংবাদিক একটি কিতাব প্রকাশ ক'রে দেখিয়ে দিলেন, যারা এককালে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিল, বহুদিনের বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের সেতু পার হ'য়ে, এখনও তারা তন্ময় প্রশ্রয়ের সঙ্গে স্মরণ করে সেই দিনগুলির কথা যখন "আমরা আদর্শের জন্যে লড়তে এগিয়ে যেতাম, অনেকের সঙ্গে এক হ'য়ে নতুন সমাজের স্বপ্নে বিভোর হতাম।"

বহু মানুষ যে একজন মানুষও নয় এটা নীলাচল বুঝতে চায় নি।

কিন্তু ১৯৪৮ সালে নীলাচল এটুকু বুঝতে পেরেছিল যে পার্টি তাকে, এবং ভারতের সর্বহারাদের, ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।

পার্টি বলছে, বিপ্লব করো, যখন বিপ্লবের কোনও সম্ভাবনাই নেই।

পার্টি আহ্বান দিচ্ছে গণ-অভ্যুত্থানের, যখন গণেরা অভ্যুত্থান দূরের কথা, শান্তিপূর্ণ অথচ সংগঠিত সংগ্রামের জন্যেও তৈরী নয়।

পার্টি নির্ভর করছে শহুরে শ্রমিকদের ওপর, যারা সংখ্যায় সামান্য, পরস্পর বিভিন্ন যুধ্যমান য়ুনিয়নে বিভক্ত, এবং বহুলাংশে অসঙ্ঘবদ্ধ, যাদের অধিকাংশের শ্রেণী সচেতনতা পর্যন্ত নেই।

পার্টির চোখ প'ড়ে নি গ্রামের সর্বহারাদের ওপর, যারা লোকসংখ্যার একশ'র মধ্যে নব্বই।

পার্টি স্বাধীনতাকে ধিক্কার দিচ্ছে। দেশের জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা যে অত্যন্ত মূল্যবান তা বুঝতে পারছে না।

পার্টি জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে রয়েছে।

নীলাচল এ সবই ১৯৪৮ সালে বুঝতে পেরেছিল। কলকাতায় এবং বম্বে ফিরে গিয়ে সেখানে নীলাচল দেখতে পেল, তার চেয়েও অনেক গভীরভাবে, অনেক বেশি বেদনার সঙ্গে, এসব বুঝতে পেরেছেন বেশ কিছু নেতারা।

'গণ-অভ্যুত্থান' ভারত সরকারের আঘাতে সহজেই নিভে যাবার পর পার্টির নেতারা আত্মসমালোচনার মধ্যে নতুন পথের অন্বেষণে লিপ্ত হলেন।

এই সময় নীলাচল প্রায় কর্মহীন দিন কাটাচ্ছিল। পার্টির কোনও লাইন নেই। ক্যাডারদের কাজকর্ম বন্ধ।

একদিন এক উঁচু স্তরের নেতা নীলাচলকে বললেন, 'তুমি বরং তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াটা শেষ ক'রে ফেল।'

বিস্মিত নীলাচলের মুখে হঠাৎ কথা সরল না।

নেতা বললেন, 'আমাদের দরকার উচ্চতম শিক্ষিত ক্যাডারের। দু বছর পড়লেই তুমি এম. এ. টা পাস করতে পারবে। ফার্স্ট ক্লাস

পেতে তোমার বিশেষ কষ্ট হবে না। পার্টির স্বার্থেই তুমি এ কাজ করবে।'

নীলাচল বুঝল, নেতা কথাগুলি উপদেশের মতো পরিবেশন করলেও তাদের পেছনে রয়েছে নেতৃমহলে কোনও সিদ্ধান্ত।

দু-বছর পরে বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরে এল নীলাচল।

শাঁখ বাজল না। কারুর মুখে হাসি ফুটল না। সবাই সভয়ে সন্দেহের চোখে তাকে দেখতে লাগল। নীলাচলের মাতাও।

সন্ধ্যার পর নিজেই নীলাচল মাননীয় বিচারপতি নীলমাধব ধরের কাছে হাজির হল।

তিনি গম্ভীর মুখে তার পানে তাকাতে নীলাচল বলল, 'আমি ফিরে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে চাই। আবার পড়াশোনা শুরু করতে চাই।'

বিচারপতি রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি দেশদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছ। তাদের সঙ্গ না ছাড়লে এ বাড়িতে তোমার থাকা চলবে না।'

নীলাচল বলল, 'পার্টির সঙ্গে এখন আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিন দিন পরে নীলাচল ধর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হল।

দুবছর পর, ১৯৫০ সালে নীলাচল ধর এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে নিল।

পত্রপত্রিকায় তার ছবি ও নাম ছাপা হল।

নীলাচল এখন আর পার্টির ধারে কাছে নেই, পুরাতন সহকর্মীদের ছায়াও সে মাড়ায় না। আমরা কেউ তার চেহারাও দেখতে পাই নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা তার কাছে কোনও অনুরোধ নিয়ে গেলে সে এক কথায় তাদের বিদায় ক'রে দেয়। আমরা পার্টির যুবকরা খোলাখুলিই বলি নীলাচল ধর আবার মূষিক হ'য়ে গেছে। আমাদের মধ্যে যাদের জিভে বিষ তারা বলে, গভর্নমেণ্টের দালাল হ'য়ে

নীলাচল পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, ঠিক সময়ে, টের পেয়ে পার্টির নেতারা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এই সময়, সালটা বোধ হয় ১৯৫০, একদিন হঠাৎ নীলাচলের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেল। লেক রোডের এক অভিজাত বাঙালী-গৃহে সান্ধ্য কবিতা পাঠে আমার নিমন্ত্রণ ছিল: ১৯৫০ সালেও উচ্চবিত্ত প্রগতিশীল বাঙালী পরিবারগুলি এ ধরনের সাংস্কৃতিক বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন। আমি যেহেতু বঙ্গের প্রথম তরুণ বামপন্থী কবি, আমার নিমন্ত্রণ থাকত প্রায়ই কোনও না কোনও বৈঠকে, সভায়, আলোচনায় অথবা পাঠচক্রে। কবিতা-সন্ধ্যার পর্ব শেষ ক'রে আমি যখন রাস্তা নিয়েছি হস্টেলে ফেরবার উদ্দেশ্যে তখন রাত প্রায় ন'টা। লেক রোড থেকে পায়ে হেঁটে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে এসে বাস বা ট্রাম ধরব, হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হ'য়ে আমি যতীন দাস রোডে এসে গেছি, এবং হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটি অতি পরিচিত মানুষের দেহ ধরা পড়েছে। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি নীলাচল ধর পাথর-মূর্তির মতো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি তার আবদ্ধ, কোনও বাড়ির জানালা অথবা ব্যালকনিতে নয়, ফিকে চাঁদের আলোয় ঈষৎ চোখ-মেলা আকাশে নয়, নয় কোনও নক্ষত্রে; দৃষ্টি তার আবদ্ধ একটুকরো সবুজ ঘাসের আস্তরণে।

আমার ডাক শুনে দারুণ চমকে উঠেছে নীলাচল, এবং আমাকে চিনতে পেরেই দৌড়ে পালাবার জন্যে শরীর বেঁকিয়েছে; আমি তক্ষুনি আবার তাকে ডেকেছি, বলেছি, 'নীলাচল, পালিও না, দাঁড়াও!' আর আমার শব্দগুলি তাকে শরবিদ্ধ ক'রে চলৎশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

বড় বড় পা ফেলে এক মিনিটে আমি নীলাচলকে ধ'রে ফেলেছি।

আমরা অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এখন বুঝি দুজন দুজনকে চিনিও না, এমনিভাবে তাকিয়ে আছি একে অন্যের মুখে। অন্তত দু মিনিট আমাদের মুখে শব্দ নেই, ল্যাম্পপোস্টের আলোর গায়ে যে অজস্র পোকাগুলি দাপাদাপি করছে তাদের পাখার শব্দ পর্যন্ত আমাদের কানে আসছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি নীলাচলের মুখের রং ফ্যাকাসে, সে কৃশ হ'য়ে গেছে, মাথার চুল কদমছাঁট, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা, পরনে সাদা ট্রাউজার আর সাদা হাফ-শার্ট, পায়ে বাটার চপ্পল। আমি আবিষ্কার করেছি নীলাচলের কপাল প্রশস্ততর হ'য়েছে, অর্থাৎ মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, এবং সে সরু একটি গোঁপ গজিয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি নীলাচলের হাতে দুখানা বই, যা সে আমাকে দেখে লুকোবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি, একখানা বারট্রাণ্ড রাসেলের 'প্রিনসিপল্‌স্ অব সোশ্যাল রিকনস্ট্রাকশন', অন্যখানা, হায় সর্বনাশ। কার্ল মার্কসের 'এ ক্রিটীক অব গথা প্রোগ্রাম!'

নীলাচল ধর এখনও কার্ল মার্কস্ পড়ছে! এবং পড়ছে এমন সব বই আমি যার নাম যদি বা শুনেছি, ছুঁয়েও দেখি নি।

যখন আমরা বন্ধু ছিলাম, কথা তো আমিই বলতাম, নীলাচল মাঝে মাঝে দাঁড়ি কমার মতো হুঁ না করত। এখন আমরা বন্ধু নই, অতএব কথা তো আমাকেই বলতে হবে!

'কী রে, তোর খবর কি? তুই যে একেবারে বেপাত্তা। কোথাও তোকে দেখতে পাওয়া যায় না। পার্টি না হয় ছেড়েছিস তা ব'লে কি আমাদের ছায়াও মাড়াবি না? তোর সঙ্গে কি আমার শুধু পার্টির সম্পর্ক? পরীক্ষায় অমন দারুণ রেজাল্ট করলি আমাদের কি আনন্দ হয় নি? একটা খাওয়াও তো পাওনা আছে, না-কি তাও নেই? তা, এখন কি করছিস তুই? এত রোগা হ'য়ে গেছিস কেন?...

আমি যতোই কথা বলছি ততো নার্ভাস হ'য়ে যাচ্ছি, আমার প্রশ্নগুলি ম্যাজিসিয়ানের গলা থেকে বলের মতো বেরিয়ে আসছে সুতোর টানে, শেষ নেই, শেষ নেই, আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়ছি নীলাচলের পানে, একটারও জবাব চাইছি না, আমার কপালে ঘাম, হাত ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি সাপের মতো শীতল চোখে নীলাচল আমাকে দেখছে, তার দৃষ্টিতে স্পন্দন নেই, সে বুঝি নিশ্বাস প্রশ্বাসও নিচ্ছে না, নীলাচল একেবারে পাথর।

অবশেষে নীলাচল কথা বলল।

'তোর সময় আছে?'

আমি বললাম, 'ঐ একটা জিনিসের আমাদের কারুর অভাব নেই।'

'চল, দেশপ্রিয় পার্কে গিয়ে বসি।'

নিঃশব্দে আমরা মিনিট দশেক হেঁটে দেশপ্রিয় পার্কে ঢুকেছি, এবং দক্ষিণ কোণে ঘাসের ওপর বসেছি।

নীলাচল বলল, 'তোর নতুন কবিতার বই পড়লাম।'

আমি কিছু বলার আগেই নীলাচল আবার আবৃত্তি করল :

Choose something like a star
It asks a little of us here.
It asks of uncertain height.

আবৃত্তি শেষ ক'রে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কার লেখা জানিস?'

আমি আত্মরক্ষার ধর্ম নিয়ে বললাম, 'আমি কবিতা লিখি, অন্যের কবিতা পড়ি না।'

নীলাচল বলল, 'রবার্ট ফ্রস্ট।'

আমি বললাম, 'অ।'

নীলাচল বলল, 'ভীষণ প্রতিক্রিয়াপন্থী আমেরিকান, কিন্তু ভালো কবিতা লেখে।'

এত বড়ো একটা দ্বন্দ্বমূলক বাক্য বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিবাদ উচ্চারণ করবার আগেই নীলাচল বলল, 'সেক্‌সপীয়র কমিউনিস্ট ছিল না, কিন্তু মহাকবি ছিল।'

'তাতে কি প্রমাণ হল?' এতক্ষণে আমি রুখে দাঁড়ালাম, অবশ্য ব'সে ব'সেই।

'প্রমাণ হল যে বেঁচে থাকবার জন্যে, মাটি থেকে অন্তত একটু উঁচুতে, ওঠার জন্যে, প্রয়োজন অন্তত একটি নক্ষত্রের। নক্ষত্ররা আমাদের কাছে কিছু একটু দাবি করে—অন্তত সামান্য একটু উচ্চতা দাবি করে।

হায়, হায়, নীলাচল ধরও কি কবি হ'য়ে গেছে !

নীলাচল বলল, 'পার্টি আমার কাছে ছিল, একটা নক্ষত্র। আমি কিছুটা উঁচুতে উঠেছিলাম। এখন আবার নিচে নেমে গেছি। বোধহয় জানিস পার্টির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

আমি শুধু বললাম, 'শুনেছি।'

নীলাচল কণ্ঠে পাথর ঘষার আওয়াজে বলল, 'সবাই আমাকে গাল দিচ্ছে তো?'

আমি শুধু বললাম, 'সবাই নয়, কেউ কেউ।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে নীলাচল বলল, 'আমি যে পার্টি ছেড়ে দিয়েছি তার দোষ আমার নয়। দোষ পার্টির।'

আমি চুপ ক'রে শুনলাম।

নীলাচল বলল, 'আমাকে, আমার মতো আরও অনেককে, ধ'রে রাখবার মতো ক্ষমতা পার্টির নেই। ধ'রে রাখতে গেলে চাই কাজ। এমন সব কাজ যা দেশের মাটির মধ্যে থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনা তৈরী করতে পারে। আমি ভেবে ভেবে বুঝতে পারছি পার্টি এখনও তেমন কর্মপন্থা আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই ১৯৪৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের লাইন যখন ব্যর্থ হ'য়ে গেল, পার্টির রসদ গেল হঠাৎ শূন্য হ'য়ে, পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি স'রে গেল। নেতাদেরই একজন বলল, বাছা, এখন আর তোমার করণীয় কিছু নেই, লক্ষ্মীছেলে হ'য়ে ঘরে ফিরে যাও, পড়াশোনা শেষ করো গে।'

শুনে আমি অবাক হলাম। এই ভিতরকার খবর আমাদের জানা ছিল না।

নীলাচল ব'লে চলল, আজ আর ওর কথার শেষ নেই: 'সেই লেজগুটিয়ে আবার যখন বিচারপতি নীলমাধব ধরের আদালতেই ফিরে আসতে হল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, এটাই আমার জীবনের আসল কঠিন বাস্তব, এর থেকে আমার অব্যাহতি নেই, মুক্তির পথ তৈরী ক'রে দিতে পারে এমন ক্ষমতা নেই পার্টির। তাই যখন বিচারপতি-

নীলমাধব ধরের সমাজেই প্রত্যাবর্তন করতে হল, তখন এই সমাজেই বেঁচে থাকবার একটা পথ বার করতে হবে। আমার এখন কোনও সন্দেহ নেই যে এই সমাজ ভারতবর্ষে আধিপত্য করবে অনেক, অনেক বছর। একে ঘায়েল করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই।'

এবার আমি সেই প্রশ্নটা ক'রে বসলাম যা অনেকদিন করতে চেয়েছি, পেরে উঠি নি।

'নীলাচল, তুই পার্টিতে এলি কেন?'

'আমিও নিজেও এই প্রশ্ন হাজার বার করেছি এই দু'বছরে। জবাবটাও পেয়ে গেছি। পর্যাপ্ত প্রাচুর্যে মানুষ হ'য়েও আমার মধ্যে অনেক রাগ অভিমান নালিশ জমা হ'য়েছিল। আমি জন্মাবার আগেই আমার বাবা ম'রে গিয়েছিলেন, বাড়ির সবাই, বিশেষ ক'রে আমার মা, তার জন্যে আমাকেই অপরাধী ক'রে রেখেছিল। অনেকদিন মা আমাকে কাছে টানে নি, যখন টানতে গেল, তখন আমিই বেঁকে বসলাম, কাছে যাবার রুচি আমার রইল না। দাদা-বৌদিদের সঙ্গেও আমার দূরত্ব কোনওদিন ঘুচল না। অথচ আমাদের মতো রক্ষণশীল শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবারে বিদ্রোহ করবার মতো সাহসও আমার ছিল না। অনেক বড়ো একটা আদর্শের জোর না পেলে নিজের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব জাহির করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি পার্টির মধ্যে সেই বড়ো ও মহান আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলাম। পার্টির ওপরে নির্ভর ক'রেই আমি আমার আত্মীয়দের শাস্তি দিতে পেরেছিলাম। আমার বিদ্রোহ কোনও সমাজব্যবস্থা বা শ্রেণীর বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল আমার পরিবারের বিরুদ্ধে।'

আমি বললাম, 'তোর পরিবার সমাজ আর শাসন শ্রেণী তো একই, তাই না?'

'হোক না এক, কিন্তু বিদ্রোহের সে গভীর চেতনা আমার মধ্যে নেই। আসলে কি জানিস, আমার দেশকে আমি চিনিই না। কিতাব পড়ে, শ্লোগান আউড়ে, বক্তৃতা শুনে দেশকে চেনা যায় না। অন্য

দেশের দৃষ্টির চশমা দিয়ে দেশকে দেখতে পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় কি জানিস? আমার মনে হয়, পার্টি এখনও দেশটাকেই চিনতে জানতে পারল না। দেশের মানুষের মানসিকতার সঙ্গে তোদের মিশে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তোরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন। আর বিচ্ছিন্ন বলেই একের পর এক ভুল পথ বেছে নেওয়া। বেছেই-বা তোরা নিজেরা নিচ্ছিস কোথায়? অন্যরা তোদের জন্যে পথ বেছে দিচ্ছে। তাই কিছুটা এগিয়েই দেখতে পাচ্ছিস, পথ নয়, অন্ধ গলি। তা নইলে ১৯৪৮ সালের নাগরিক অভ্যুত্থান ১৯৫০ সালে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন, এমন সব একের পর এক রোমান্টিক বিভ্রান্তি ঘটতে পারে? এর কোনওটার সঙ্গেই ভারতবর্ষের বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। ১৯৪৮ সালের অন্ধগলির মতোই '৫১ সালও অন্ধগলিতে সমাপ্ত হ'তে বাধ্য।'

নীলাচল যা বলছিল তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর সায় ছিল ১৯৫০ সালে। আমি চাষীদের লালঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, বলেছি, ভাইরে, দিন এসে গেছে, এবার লাঙ্গলের ফালে আগাছা উপড়ে ফেল, কাস্তের মুখে নতুন লাল ফসল তুলে নাও। কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি, পারছি না, চীনের মতো আমাদের দেশেও গরীব চাষীরা বন্দুক হাতে গেরিলা লড়াই করছে, মুক্ত করে ফেলছে গ্রামের পর গ্রাম, এবং সে সব মুক্ত গ্রামে আমরা তৈরী ক'রে ফেলছি লাল সরকার। এতোটা সাহস আমি কবিতাতেও আনতে পারি নি, বাস্তব চিন্তায় তো দূরের কথা।

অতএব নীলাচলের কথাগুলি আমি শুনেই চলেছি, আমার মতো মানুষের বকবক জিহ্বাও স্তব্ধ হ'য়ে গেছে।

নীলাচল বলছে, 'প্রায়ই একই সময়ে চীন ও ভারতে পার্টির জন্ম হ'য়েছিল, অথচ আজ চীনের পার্টি কোথায় আর আমরা কোথায়? (নীলাচল এখনও, আমি লক্ষ্য করছি, পার্টির সঙ্গে অন্তত মাঝে মাঝে নিজেকে সনাক্ত না ক'রে পারছে না।) আসলে আমাদের দেশে

পার্টি তৈরীর গোড়াটাই ভুল ছিল। যে পদ্ধতিতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির কখনও জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়, সে পদ্ধতিতেই আমাদের পার্টি জন্মেছিল ভারতবর্ষে। সোভিয়েত দেশ থেকে এজেন্টরা এসে এখান ওখান থেকে গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবী মার্কসিস্টকে একত্র ক'রে একটা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী ক'রে দিয়ে গেল। মুজাফর আহ্‌মেদ আর শ্রীপদ দাঙ্গে একে অন্যকে চিনতেন না পর্যন্ত! কোনও গভীর মাটি-ঘেঁষা সংগ্রাম ও আন্দোলন থেকে জন্ম হল না পার্টির, বরং জন্মেই সে একই সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বসল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে! আর চীনদেশে? ওখানকার কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সেতু বাঁধতে চেষ্টা ক'রে গেছে, এবং শেষ পর্যন্ত জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে চীনা জাতীয়তাবাদকে নেতৃত্ব দিতে পেরেই বিদ্যুৎগতিতে বিপ্লবকে সাফল্যের সীমান্ত পার ক'রে নিয়ে যেতে পেরেছে। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে না পারলে আমাদের চলবে না, চলবে না।'

আমার শরীর হঠাৎ শিউরে উঠল। কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হবার নামে আমার বমি পেল।

নীলাচল কিন্তু বলেই চলেছে: 'জাতীয়তাবাদ সব শ্রেণীর সমান নয়। শ্রমিক কৃষকের জাতীয়তাবাদ জমিদার-মহাজন-শিল্পপতিদের জাতীয়তাবাদ থেকে আলাদা। কিন্তু এই পার্থক্য ধরা পড়বে না যতোদিন কমিউনিস্টরা জনসাধারণের জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দিতে পারবে। এটা পারা মোটেই সম্ভব নয় স্বাধীনতাকে হেয় ক'রে, তাকে অপমান করে, কেননা স্বাধীনতা যতোই সীমিত হোক না কেন তবু তা স্বরাজ, এবং জনসাধারণ তাকে বহুকালের সংগ্রামের ও নির্যাতনের পুরস্কার ব'লে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। তা ছাড়া এই দু'বছরের একাকীত্বে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে ভারতবর্ষের মতো গ্রামীণ দেশে গ্রামের গরীবদের সমবেত ক'রে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে না আনতে পারলে বিপ্লবের কোনও সম্ভাবনা নেই। চাষীদের মধ্যে আন্দোলন, সংগ্রাম, সংগঠন না ক'রেই সশস্ত্র কৃষক-গেরিলা যুদ্ধের

হুংকার তোলা এক চূড়ান্ত বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা। তোমাদের শাস্ত্রে এর একটা নাম আছে, তা আর নাই মুখে আনলাম।'

হঠাৎ নীলাচল উঠে দাঁড়াল, আমাকে হতভম্ব ক'রে দিয়ে বিদায়-সূচক একটি কথাও না ব'লে, হন হন ক'রে পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তার আধো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরের বছর একদিন খবরের কাগজে দেখতে পেলাম নীলাচল আই. এ. এস. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে বসেছে। আই. এফ. এস. লিস্টে তার নাম নেই, অর্থাৎ নীলাচল ফরেন সার্ভিস প্রথম থেকেই নিতে রাজি হয় নি।

পার্টি মহলে নীলাচলকে নিয়ে আবার একটু কথাবার্তা ঠাট্টা-উপহাস শোনা গেল। কিন্তু যেমন তরল তেমনি ক্ষণিক। আমরা যারা পার্টির লোক, আমাদের মন থেকে নীলাচল প্রায় মুছে গেছে।

আমার মন থেকে নয়। কারণ, বোধহয়, আমি নীলাচলকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সে শুধু আমার পার্টি কমরেড ছিল না, ছিল আমার বন্ধুও।

দেশপ্রিয় পার্কে ব'সে নেশাগ্রস্তের মতো একটানা ব'কে যাওয়া তার কথাগুলি আমি নিজের স্মৃতিতেই রেখে দিয়েছিলাম। কাউকে এই স্মৃতির ভাগ দেবার আমার ইচ্ছে হয় নি।

॥ তিন ॥

আমার নাম নীলাচল ধর। আই. এ. এস। আমি জব্বলপুরের জেলা শাসক। পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে আমার এখন ছত্রিশ চলছে। আমার মাথায় মস্ত বড় টাকের জন্যেই বোধহয় আমাকে আরও বয়স্ক দেখায়। অনেকে ভাবে আমার পঁয়তাল্লিশ আর কোনও দিন হবে না। আমি

নিজে ভাবি, আমি বুঝি শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি, এবং বোধহয় আরও এক শতাব্দী আমাকে অতিক্রম করতে হবে।

এই প্রাচীন সনাতন ভারতবর্ষে সবকিছুই পুরাতন। মানুষও। মানুষের মনও।

ভারত প্রজাতন্ত্রের সি. পি. অ্যাণ্ড বেরার নামে একটি প্রদেশ ছিল। কালক্রমে, প্রাদেশিক ভূগোলকে ঢেলে সাজাবার সময়, বেরার চলে গেল মহারাষ্ট্রে। বেরারের দিশী নাম বিদর্ভ। প্রদেশগুলি হল রাজ্য। সেণ্ট্রাল প্রভিনসেব নাম বদলে রাখা হল নতুন নাম : মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ জংলো ভূমি ছত্রিশগড়। ছাত্রিশগড়ের সবচেয়ে বড় শহর জববলপুর। আমি তার জিলা শাসক।

সিভিল লাইনস-এ আমার মস্ত বড় বাংলো বাড়ি। সাত একর জমির ওপর। বিরাট বিরাট গাছ, মস্ত লন, প্রকাণ্ড ফুলের বাগান, এবং আমার সখে তৈরী, একটি ছোট্ট হট-হাউস। ফুলের বাগানের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়, তাতে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম ফোটে প্রতি বছর। বাগানে কাজ করবার জন্যেই আমার বরাদ্দ চার চারটে লোক, একজনকেও আমাব মাইনে দিতে হয় না। বাবুর্চি, অর্ডারলি, চাকর, সিপাই, লোকের অন্ত নেই আমার বাংলোয। আমার দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষীও আছে। বন্দুকধারী সিপাহী আমার বাড়ির ফাটক পাহারা দেয়। আমার একখানা ফিয়াট গাড়ি একটা জীপ ; দুটোই সরকারী সম্পত্তি, যা আমি নিজের সম্পত্তির মতোই ব্যবহার করি।

বিস্তীর্ণ জববলপুর জিলার সর্বেসর্বা আমি। ডেপুটি কমিশনার, কালেক্টর এবং বিচারক। সারা জিলার শাসনভার আমার ওপর। আমার অনেক প্রতাপ, প্রচণ্ড ক্ষমতা, লক্ষ লক্ষ লোকের মা-বাপ-হুজুর আমি, আমার ভয়ে বাঘে শেয়ালে এক ঘাটে জল খায়।

কিন্তু আমি জানি, যা ঈশ্বরও জানেন না, আমার শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই এমন কিছু করবার যা আমি করতে চাই, অথবা চাইতাম ; এখন আর আমি কিছু করতে চাই নে।

কিন্তু এখনও আমি নিকষ-কালো আকাশের বুকে ঝিকিমিকি নক্ষত্র দেখতে ভালোবাসি।

'A star looks down at me,
And says, 'here I and you
Stand, each in our degree :
What do you mean to do ?'

আমার এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি কিছু কথা আছে, ভোরের বেলায় তারাদের সঙ্গে, বুঝি কিছু...

আজ ১৯৫৮ সালের ২৬শে নভেম্বর। বুধবার।

এখন সকাল আটটা বেজে সাতান্ন মিনিট।

জব্বলপুরে বাস করবার অনেক আরামের মধ্যে একটা হল, এখানে প্রভাতী সংবাদপত্র নেই। সকাল বেলাই উন্মাদ পৃথিবী আক্রমণ ক'রে বসে না আমাকে। নিতান্ত রাজকীয় কর্তব্যের প্রয়োজনে আমি রেডিয়ো খুলে প্রভাতী সংবাদ না-শুনি। চীনের কমিউনিস্টরা চিয়াং কাইসেক দলিত ও মার্কিন নৌ-ও-বিমান বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত কুওময় ও মাৎস্যু দ্বীপের ওপর যে কামান দেগে যাচ্ছে তা আমাকে সকালেই শুনতে হয় না। শুনতে হয় না আইসেনহাওয়ার অথবা ডালেসের সুবচনী অথবা ক্রুশ্চেভের হুংকার অথবা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর অমৃতবাক্য।

সকালটুকু অনেক সময়ই একান্ত আমার।

পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙে। পাখির ডাকে। পাতার ওপরে হাওয়ার হাত বুলানির শব্দে। প্রতিদিন আমার সঙ্গে এক অপরূপ সুন্দরীর দেখা হয়।

তার নাম ঊষা।

সে বড় বড় গাছগুলোয়, স্বল্প-খোলা আকাশে, বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে, নীরব নির্জন রাস্তায় আমার চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর, তাকে বিদায় দিয়ে, আমি ব্যায়াম করি। জিলা শাসককে স্বাস্থ্যবান থাকতে হয়। নার্ভ শক্ত রেখে শাসন করতে হয় তাকে।

স্নান সেরে পোশাক-আশাক পরেও, আমি ঘণ্টা খানেক সময় পাই যা অনেক সময় একান্ত আমারই।

আমার স্ত্রী, অপরাজিতার আটটার আগে নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

আমাদের একমাত্র কন্যা, নিবেদিতা, তার দাদু দিদিমার কাছে থেকে কনভেণ্ট অব জীসাস অ্যাণ্ড মেরীতে পড়ে।

নিবেদিতার দাদু, অপরাজিতার বাবা, আমার শ্বশুর, ভারত সরকারের উচ্চতম আমলা-পদগুলির মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম পদের অধিকারী।

প্রভাতের এই অবসরটুকু সাধারণত আমি রাজ-সেবায় অপব্যয়িত হ'তে দি' না। আমার প্রশাসনপর্ব শুরু হয় প্রাত্যহিক জলযোগের পর, ঠিক সকাল ন'টায়, যখন পুলিশ সুপারিটেনডেণ্ট জগন্নাথ দুবে প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনার জন্যে জীপে ক'রে এসে হাজির হন। অবশ্যি কখনও কখনও ভোর বেলাও আমাকে রাজকার্যে লিপ্ত থাকতে হয়, এই ধরুন যখন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে, অর্থাৎ বাধান হয়, অথবা মুখ্যমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সফরে জব্বলপুরে এসে হাজির হন। মধ্যপ্রদেশ, সৌভাগ্যের বিষয়, নিরুপদ্রব প্রদেশ, জব্বলপুরও, অতএব, সাধারণত শান্ত। এই জিলার শান্তশিষ্ট প্রজাবর্গ মালগুজারদের ক্ষমতার কাছে মাথা নত ক'রে প্রস্থরায়িত। কালেজের ছাত্রছাত্রীরা ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে মিছিলে বার হয় না। এখানে শ্রমিক সংখ্যা সামান্য, যেহেতু শিল্পের অভাব। একমাত্র বিরোধ, যা জিলা প্রশাসনকে বছর-দু-বছরে একবার নাস্তানাবুদ ক'রে তোলে, সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ গরীব হিন্দু ও মুসলমানে। এ বিরোধগুলিও হাজার খানেক লীগ ও আর-এস-এস পন্থীদের জেলে পুরতে পারলে, বড় জোর কয়েক রাউণ্ড গুলি চালালেই, স্তব্ধ হ'য়ে যায় বছর দু-বছরের মতো। সুতরাং আমার প্রভাতের ঘণ্টাব্যাপী অবসরটুকু সাধারণত আমি বই প'ড়ে কাটাই। বই আমার জীবনের প্রধান, প্রথম এবং অন্তিম ইনভেস্টমেণ্ট। বই ছিল তাই আমি আজও বেঁচে আছি, অন্তত নিজেকে আমি এটুকু সান্ত্বনা দি'। জব্বলপুরে ব'সে বই কেনা মোটেই সহজ কাজ নয়, আমি যে-সব

বই পড়তে চাই, পড়তে ভালোবাসি, এখানকার বই-এর দোকানীরা তাদের নামই শোনে নি। অন্য জিলা শহরেও আমার একই অভিজ্ঞতা। তাই বই আমাকে দিল্লী, কলকাতা অথবা লণ্ডন থেকে ডাকযোগে আনাতে হয়।

এ নিয়ে বার বার আমাকে মুস্কিলে পড়তে হ'য়েছে। যখন আমি দ্রুগ জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, তখন কলকাতা থেকে ডাকযোগে আমার নামে একটা বই-এর পার্শেল আসে। পোস্ট মাস্টারটি ছিল আবার গোয়েন্দা পুলিশের চরও। পার্শেলের প্রেরক ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। পোস্ট মাস্টার জানত এই দোকানে বামপন্থী কিতাবই শুধু বিক্রি হয়। ঠিকানা প'ড়ে সে কি করবে বুঝতে না পেরে গোয়েন্দা পুলিশের শরণাপন্ন হয়। এ. ডি. এম লোকটা কেন কমিউনিস্ট বই কিনে পড়বে, তাও আবার ডাকে আনিয়ে? মানুষটা যখন বাঙালী তখন বিশ্বাস নেই। হোক না আই-এ-এস, তলে তলে কমিউনিস্টও তো হ'তে পারে! গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররাও ব্যাপারটা দেখে ভাবিত হ'য়ে পড়ল। অবশেষে তাদের উর্ধ্বতম অফিসারের কাছে পার্শেলটা দাখিল করা হল। এই লোকটি পার্শেল হাতে ক'রে আমার কাছে এসে হাজির একদিন সকাল বেলা, আমার বাড়িতে।

যা নিবেদন করল তাতে বোঝা গেল, বইগুলো সত্যিই আমি আনিয়েছি কিনা তা সে যাচাই ক'রে দেখতে এসেছে। কমিউনিস্টরা এখন মধ্যপ্রদেশেও ঘাঁটি তৈরী করবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যদি বইগুলি আমার না হয় তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ দ্রুগ শহরে আছে যে আমার নাম ক'রে কমিউনিস্ট কিতাব আনবার চেষ্টা করছে।

আমি লোকটিকে বললাম, 'বইগুলি আমারই।'

সে শুনে অবাক এবং সন্ত্রস্ত হল এবং মুখে বলল, 'নিশ্চিত হলাম, স্যার। অপরাধ মাপ করবেন।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ডাকে কমিউনিস্ট বই আনা কি বে-আইনী?'

সে চটপট জবাব দিল, 'না, স্যার। তবে যারা আনে তাদের ওপর আমাদের নজর রাখতে হয়।'

আমি হেসে বললাম, 'তাহলে আমার ওপরেও নজর রাখবেন।'

আঙুল দিয়ে কান ছুঁয়ে লোকটি বলল, 'তোবা! তোবা!'

আমি বললাম, 'কমিউনিস্টরা কি ভাবছে, কোন পথে চলছে, কি তাদের মতলব, এসব তো আমাদের খুব ভালো ক'রে জানা দরকার, তাই না?'

সে বলল, 'নিশ্চয়, স্যার। আপনি তো জানেনই, স্যার, গভর্নমেণ্ট কমিউনিস্টদেরই প্রধান দুশমন মনে করেন। ওরা পাকিস্থানের চেয়েও বড় শত্রু।'

'ওদের বইপত্র না পড়লে ওদের কথা আমরা জানব কি ক'রে?'

আমার কথাগুলি লোকটাকে যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট করল। কিছু জানতে গেলে বই পড়তে হবে একথা সম্ভবত এর আগে কোনও এ-ডি এম বা ডি এম বা এস-পি তাকে কখনও ব'লে নি।

লোকটার নাম ছিল দেওকীনন্দন পণ্ডিত। আমি বললাম, 'পণ্ডিত, আমার লাইব্রেরীতে শ তিনেক বই আছে কমিউনিজম সম্বন্ধে। ঐ তো দরজাটা খুললেই দেখতে পাবেন। কিন্তু তাই ব'লে আমি কমিউনিস্ট নই, আমি আপনার মতোই সরকারের বংশবদ সেবক।'

দেওকীনন্দন পণ্ডিত মাথা হেঁট ক'রে করজোড়ে বলল, 'নিশ্চয়, স্যার, নিশ্চয়।'

আমি এখনও তাকে রেহাই দিতে প্রস্তুত নই।

'দেওকীনন্দনজি, আপনি নিশ্চয় জানেন কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫২ সাল থেকে পার্লামেণ্টে নির্বাচনের মাধ্যমে অন্যান্য সব দলগুলির মতোই রাজনীতি করছে।'

'জানি, স্যার, লেকিন...'

'কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস, জনসংঘ ইত্যাদি পার্টির মতোই বৈধ?'

'লেকিন, স্যার, লেকিন...'

'ধরুন, দেওকীনন্দনজি, এই রাজ্যে, চুণাও'র মাধ্যমে কমিউনিস্টরা সরকার গঠন ক'রে বসল ?'

'তা তো কক্ষনো হতে পারবে না, স্যার, কখনও না···'

'কেন হ'তে পারবে না, দেওকীনন্দনজি ?'

'পণ্ডিতজি, মানে, কেন্দ্র সরকার তা কক্ষনো হ'তে দেবেন না, স্যার।'

'ঠিক বলেছেন, দেওকীনন্দনজি। তা হ'তে দেব না। তাই না ?'

'নিশ্চয় স্যার, নিশ্চয়।'

'তা'হলে তো আপনার-আমার দুর্ভাবনার কারণ নেই। আমি কমিউনিস্টদের সব কিতাব প'ড়ে রাখছি। ওদের সব চালচুলো আমার জানা থাকছে। ওরা কোনও শয়তানীই এ রাজ্যে করতে পারবে না, দেওকীনন্দনজি। এখন আপনি নিশ্চিন্তে প্রস্থান করতে পারেন।'

এ হাস্যকর ঘটনার পরে চার বছর পেরিয়ে গেছে। আমি আরও একটি জেলার এ. ডি. এম. হ'য়েছি এবং দুটি জেলার ডি. এম.। বই আমার নামে ডাকযোগে এসেই চলেছে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও জানেন আমি কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দরকার হ'লে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান কমিউনিস্ট-দমন নিয়ে আলোচনা করতে। দরকার বিশেষ হয় না। এই চার বছরে মাত্র দুবার হ'য়েছে। সে কথা পরে বলছি।

গতকালই আমি দিল্লী থেকে একটা বহুপ্রতীক্ষিত বই পেয়েছি। মায়াকভ্স্কির একগুচ্ছ কবিতা, হার্বার্ট মার্শালের ইংরেজী অনুবাদে। বইটা খুলে একটা কবিতাই কাল রাত্রে পড়তে পেরেছিলাম, মনের মধ্যে এমন ওলটপালট হ'য়ে গেল সব কিছু যে পড়া আর এগোয় নি। লাইন-গুলি সূচের মতো আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে চলেছে ঘুম না আসা পর্যন্ত, সকালে উঠেও দেখি তারা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বিঁধছে :

Our planet
is poorly equipped
for delight
One must snatch

gladness
from the days that are
In this life
it's not difficult to die
To make life
is more difficult by far.

ম'রে যাওয়া যে কতো সহজ তা আমার অনেকদিন আগে জানা হ'য়ে গেছে।

বেঁচে থাকা যে কতো কঠিন তাও আমি জেনেছি, জানব।

বেঁচে থাকা যে কতো সহজ তা আমার জানা হবে না।

এই ত্রিশূল অনুভাবনা নিয়ে সকাল সাতটায় আমি কবিতার বইটিতে ফিরে যেতাম, কিন্তু আমার মনে প'ড়ে গেল, আজই সন্ধ্যে সাতটায় এক কবির সংবর্ধনায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে, মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা কষায়-মধুর হ'য়ে উঠল, একই সঙ্গে আমি অনেকগুলি অনুভূতির অত্যাচারে প'ড়ে গেলাম—আমার রাগ হল, আমি কৌতুক-বোধে হেসে উঠলাম, আমার রসনা বিসাদ হ'য়ে গেল, আমি পরিহাসে বিদ্রূপে ধারাল হলাম, স্নেহ আমাকে আর্দ্র ক'রে দিল।

কলকাতার বামপন্থী কবি শরৎ মিত্র এসেছেন জব্বলপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে কাব্য-শাখার সভাপতি হ'য়ে। আরও কয়েকজন প্রখ্যাত বঙ্গ সাহিত্যিকও এসেছেন, মায় সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, যাঁর 'নদীপথে' বইখানা পরম সুখে আমি বার বার পাঠ করেছি। জব্বলপুরে বাঙালীর সংখ্যা কম নয়—কলেজে, নতুন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, আদালতে, ডাক্তারীতে বেশ কিছু বাঙালীর এখানে সুনাম ও সুপ্রতিষ্ঠা। যেহেতু জিলা শাসক আমিও বাঙালী তাই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমার বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। আমিও তাদের একেবারে নিরাশ করি নি। সম্মেলনের বিশিষ্ট বক্তাদের তালিকায় শরৎ মিত্রের নাম দেখতে পেয়ে হঠাৎ একই

সঙ্গে রাগ ও স্নেহ আমাকে মথিত করেছিল, সম্মেলনের উদ্বোধনে আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি, আমার জরুরী অন্য কাজ ছিল। পরে জেনে-ছিলাম শরৎ মিত্রও উদ্বোধনের সময় হাজির থাকতে পারেন নি, তাঁরও জরুরী অন্য কাজ ছিল। তিনি এসে উপস্থিত হলেন সম্মেলনের তৃতীয় ও শেষ দিনে। তাঁকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সহজই হত, যদি না বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শরৎ মিত্রকে প্রধান অতিথি ক'রে এক বিশেষ সাহিত্য সভায় আমাকে সভাপতিত্বে বরণ করতে আসত। বাঙালীমাত্রই সাহিত্যিক, ছাত্ররা নিশ্চয় তাই মেনে নিয়েছিল, নতুবা এক জিলাশাসককে কবি-শোভিত সভায় সভাপতিত্বে বরণ করবে কেন? রাগ ও স্নেহের পুনঃ আক্রমণে আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে বসেছিলাম।

সকাল সাতটায় আমি বুঝতে পারলাম এক ঘণ্টার অবসরে যদি আমি আমার ভাষণ না তৈরী ক'রে নি তাহলে সারা দিনে এ জন্যে পনের মিনিট সময়ও আর আমার হবে না।

কিন্তু ভাষণ লেখা প্রয়োজন ব'লেই তো লেখা সহজ নয়। অবশ্যি আমাদের দেশে সচরাচর কেউ বক্তৃতা লিখে নেন না, তাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, সংযম ইত্যাদি কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য মানসিকতার প্রয়োজন হয়। রাজ-নৈতিক নেতারা তো যে-কোনও সময়ে যে-কোনও আসরে যা খুশি তাই ব'লে সংবাদপত্রে শিরোনামা কুড়োতে পারেন; তাঁদের দৃষ্টান্ত আমলা থেকে অধ্যাপক সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমিও জববলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সভায় গোহত্যা নিবারণের প্রয়োজনীয়তা এবং এই মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে এই প্রদেশের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী কি করেছেন এই অতিশয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এক ঘণ্টা বক্তৃতা করে বসতাম এবং জববলপুর-নাগপুরের হাড়-বার-করা সংবাদপত্রগুলি তাই বড় শিরোপা দিয়ে খুশি মনে ছাপত; কিন্তু মুস্কিল হল ঐ শরৎ মিত্রকে নিয়ে; তার উপস্থিতি চাবুক মেরে আমাকে সকাল সাতটায় লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে গেল, আমি দুই আলমারী ভরতি বাংলা বই-এর বিশেষিত, নিনাদিত বহুবর্ণ হুংকার শুনে নিস্তব্ধ হলাম, বইগুলির

মেরুদণ্ডে মুদ্রিত নামাবলী দেখে আতঙ্কিত হলাম ; বাংলা ভাষায় এতো বই আছে, এতো লেখক আছে, ভাবতে আমার অহংকার হল ; এবং আমার হঠাৎ মনে পড়ল, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখমণ্ডল পাংশু হয়ে গেল, যে আমাকে আজই সন্ধ্যায়, মাত্র এগার ঘণ্টার ব্যবধানে, বাংলা সাহিত্য নিয়ে কিছু বলতে হবে, অন্তত বলা আমার পক্ষে উচিত হবে। আমার চোখ আছাড় খেল পরপর সাজিয়ে রাখা পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থে, প্রত্যেকটির লেখক শরৎ মিত্র।

আমি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লাম, হাত থেকে পড়ে যাওয়া চীনেমাটির ফুলদানির মতো, শ্রীমতী অপরাজিতা ধরের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আচমকা আক্রমণে।

'তোমার ব্যাপারখানা কি ? আজ আর ব্রেককাস্ট করতে হবে না ?'

টুকরো-টুকরো আমার খণ্ডগুলিকে জোড়া দেবার চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে আক্রমণ চললই :

'পনের মিনিট আগে বলদেও ডেকে গেছে তোমাকে। তোমার নাকি একেবারে হুঁশই নেই। ব্যাপারটা কি ? সকাল বেলা শ'খানেক বাংলা বই নিয়ে বসে আছ তোমার কাজকর্ম নেই ? এ জন্যেই তো উন্নতি হচ্ছে না তোমার ! এখনও ডি. সি. হ'য়ে প'ড়ে রয়েছ পাণ্ডব-বর্জিত গ্রামে, কমিশনার পর্যন্ত হ'তে পারছ না, দিল্লী তো দূরের কথা, নাগপুরেও তোমাকে যেতে দিচ্ছে না। কি ? আজ ব্রেকফাস্ট করবে না ?'

মানুষের আত্মরক্ষার শক্তি অপরিসীম তাই এই আক্রমণের মধ্যেই আমি আমার টুকরোগুলোকে কোনওমতে গুছিয়ে নিয়েছি অপরাজিতার অপরাজেয় অভিমানের চেয়েও যা আমাকে দুর্বল ক'রে দিয়েছে তা হল চোখের বরাবর দেয়ালে ঘড়ির কাঁটাদুটো, এবং টেবিলের ওপর একের ওপরে এক হুমড়ি খেয়ে পড়া গোটা পঁচিশেক বাংলা বই।

আটটা বেজে সাতাশ মিনিট হ'য়ে গেছে !

বোঝা যাচ্ছে নোকর শ্রীমান বলদেও অন্তত একবার ডাকতে এসে আমাকে 'বেহুঁশ' দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে।

অতিশয়োক্তি প্রাচীনকাল থেকে ভাষা প্রয়োগের অন্যতম অনুমোদিত শৈলী। অপরাজিতা ধর এই শৈলীকে লক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার ক'রে থাকেন। আমি শ'খানেক বই নিয়ে বসে নেই; আমার সমসাময়িক আই-এ-এস'দের একজনও কমিশনার হয় নি; আমার 'উন্নতি' যা হয়েছে তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই; প্রাদেশিক সচিবালয়ে উপযুক্ত পদের একাধিক প্রস্তাব আমিই প্রত্যাখ্যান করেছি; দিল্লী যাবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই, অপরাজিতা ধরের যদিও তা ছাড়া অন্য কোনও ইচ্ছে তেমন প্রবল নয়।

সান্ধ্য সাহিত্যসভার জন্যে ভাষণ লেখা আমার হল না।

প্রাতরাশের টেবিলে ব'সে অপরাজিতা ধর এবং আমি উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু থেকে একে অপরের সঙ্গে বাক্যালাপসহ আহারে প্রবৃত্ত হলাম।

আমরা বোধ করি দুজনেই ভুলে গেছি, এই-যে রাতটা সদ্য কেটে গেল যার ঘনকালো গন্ধ এখনও লনের সবুজ ঘাসে আর শিরিষগাছের পাতায় পাতায় লেগে আছে, এই সদ্য-অতীত রজনীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যামের সন্ধিকালে আমরা দীর্ঘকালের অভ্যাসমত দুই উলঙ্গ দেহের প্রলম্বিত প্রচেষ্টায় সম্মিলিত অমৃত-সন্ধান ক'রে পরিতৃপ্ত ক্লান্তির সঙ্গে অধিকতর সুখে নিদ্রাকে গভীর আলিঙ্গন ক'রে প্রভাতের সিংহদ্বার পেরিয়ে এসেছি। আমি, আকাশের তারাগুলি সবাই বিদায় নেবার আগেই অপরাজিতা ধর, প্রথম সূর্য সামান্য বাসি হ'য়ে শয়নগৃহে পায়চারি করবার পরে।

বাবুর্চি পরিবেশিত জেলীমাখনটোস্টে কামড় দিতে দিতে অপরাজিতা ধর বলছেন, 'বাবার চিঠির জবাব দিয়েছ ?'

দুধে গলে যাওয়া কর্নফ্লেক্স চামচে করে মুখে পুরতে পুরতে জবাব দিচ্ছি, 'দেব।'

'ক'দিন হয়ে গেল মনে আছে ?'

'দিন তিনেক হবে।'

আজ পাঁচ দিন।'

'তাই নাকি ?'

'তোমার নিজের কাজকর্মে তো বিস্মৃতির চিহ্নমাত্র দেখতে পাই নে।'

আমি কর্নফ্লেক্স শেষ ক'রে ডিম-পোচ্-এ ছুরিসংযোগ করছি।

'কি লিখবে ?'

আমার মুখে আর্ধেক ডিম, এবং এক-কামড় পাঁউরুটি।

'জবাবে কি লিখবে ?'

'লিখে দেব কিছু একটা!'

অপরাজিতা ধর এতক্ষণে ডিম শেষ ক'রে কফির কাপে ওষ্ঠাধর সংযুক্ত করেছেন।

'তার মানে তুমি এবারও দিল্লী যাবে না!'

আমি চা প্রায় শেষ ক'রে এনেছি।

'কিছু বলছ না যে ?'

'বলার কি আছে ?'

'তুমি দিল্লী যাচ্ছো, কি যাচ্ছো না ?'

'তাড়া কি ?'

'বছরের পর বছর এই অজ পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে থাকতে হবে ?'

এই আর্তনাদ আমি বহুবার শুনেছি। আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে।

'বাবা আর ক'দিন চাকরিতে থাকবেন ? এখন যদি সুযোগ না নাও তোমাকে এই গ্রামেই সারা জীবন থাকতে হবে।'

আমি ঘড়িতে সময় দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি।

অপরাজিতা ধরের কণ্ঠস্বর জোরাল হ'য়ে উঠেছে :

'তুমি যদি না যাও আমি এবার দিল্লী চলে যাবো।'

'ইচ্ছে হ'লে কিছুদিনের জন্যে ঘুরে আসতে পারো।'

আমাকে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে অপরাজিতা ধরের ধৈর্য আঁচলের মতোই খ'সে পড়ল।

'এবারে গেলে আর ফিরব না।'

'তা তুমি পারবে না,' বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা আপিস ঘরে এসে বসেছি। আমার টেবিলের ওপর দৈনন্দিন ক্যালেণ্ডার অর্ডারলি বদলে রেখে গেছে। ৭ই জুলাই ১৯৫৮। আমি ঘড়ির ওপর চোখ রেখে দেখতে পাচ্ছি, আটটা বেজে সাতান্ন মিনিট।

আর তিন মিনিটের মধ্যে আমার রোজনামচা শুরু। রাস্তায় আমি জীপের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট হীরালাল তিওয়ারী আসছেন। প্রতিদিন সকাল ন'টায় তিনি আমাকে জিলার শান্তি শৃঙ্খলা বিষয়ে মৌখিক রিপোর্ট দিয়ে থাকেন। তিওয়ারী বিদায় নেবার আগেই এসে যাবেন গৌরমোহন মিশ্র। সদর এস. ডি. ও। এবং তার পরেই প্রভাতের প্রথম সাক্ষাৎপ্রার্থীরা।

দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে আমি কাছারিতে আমার নিজের আপিসে হাজির হই। সকাল বেলা আমি কাউকে দর্শন দি'না রাজ-পুরুষ ছাড়া। যারা আবেদন নালিশ, দাবি নিয়ে সাক্ষাতের জন্যে আসে তাদের তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অবশ্যি তারা সাধারণ মানুষ। রায়বাহাদুর অম্বিকাপ্রসাদ দুবে এম. পি.-কে নিশ্চয় আমি এক মিনিটও বসিয়ে রাখি না। বসিয়ে রাখি না বিধান সভার সদস্যদের, জিলা নেতাদের। বাকী যারা তারা অপেক্ষা করবার জন্যে তৈরী হ'য়েই আসে। এ প্রাচীন দেশে যে পদার্থের বিন্দুমাত্র অভাব নেই তার নাম সময়।

একজন জিলা শাসকের ক্ষমতার শেষ নেই। জিলার সব কিছু ভার তার ওপর ন্যস্ত। রাজস্ব আদায় থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে উন্নয়নের সব কিছু। তবু ভাল, বিচারকের আসরে আমাকে এখন আর বসতে হয় না; এ রাজ্যে প্রশাসন আর বিচার দুভাগ হ'য়ে গেছে। এত বেশি ক্ষমতা আছে বলেই জিলা শাসকের সাধ্যি নেই কোনও কিছু ক'রে ওঠবার। যা যেমন আছে তাকে ঠিক তেমনি রাখতে পারার প্রচেষ্টায় তার দিন কাটে, দিনে দিনে সপ্তাহ, মাস, বছর কেটে যায়। যা যেমন ছিল তাই থাকে।

এস. পি. হীরালাল তিওয়ারী। পঞ্চান্ন বছর বয়স, দেখায় পঁয়ষট্টি। চুল একেবারে সাদা। চারটে দাঁত বাঁধান। বিরাট ভুড়িদার দেহে খাকি পোশাক ধ'রে রাখতে পারে না, বেল্‌ট্ ফেটে এই বুঝি ভুঁড়িটা বেরিয়ে আসবে আমারই চোখের সামনে। ইয়া সাদা গোঁফ, বড় বড় জুলফি। সকাল ন'টায়ও দুটি চোখ লাল।

'নো প্রব্লেম?' আমার ধরা-বাঁধা প্রশ্ন।

'দুটো রেপ, চারটে খুন, গোটা তিনেক আরসন।'

'শহরে না গ্রামে?'

'সবগুলিই পাড়াগাঁয়ে।'

'কে কাকে রেপ করল?'

'মমিনপুর গ্রামে মালগুজার নাকি এক চাষীর বৌকে রেপ করেছে। বল্লভপুরে রেপ হয়েছে একটা হরিজন মেয়ে।'

'লোকটা কে?'

'গ্রামের চৌকিদার।'

'এফ-আই-আর কে করাল?'

'দুটো কেসই গ্রামের লোকেরা থানায় ডায়েরী করিয়েছে।'

'আরসন হল কোথায়?'

'গঙ্গানগর ব্লকে দশটা হরিজনদের কুঁড়ে পুড়ে গেছে।'

'কারা করল?'

'মনে হচ্ছে মালগুজার বা তার লোক।'

'খুন?'

'চারটে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে একটি ক'রে।'

'নো প্রব্লেম?'

'নো প্রব্লেম। এ সব তো হ'য়েই থাকে!'

'আপনি যাচ্ছেন কোথাও?'

'নাঃ। ট্যু স্মল দীজ ইনসিডেণ্টস্।'

'রাইট।'

'সন্ধ্যাবেলা য়ুনিভারসিটিতে মিটিং আছে। কলকাতা থেকে নাকি এক কমিউনিস্ট আসছে। নাম মিত্র।'

'জানি। নাথিং টু ওয়ারি। আমি যাচ্ছি। আমাকে প্রিজাইড করতে বলেছে।'

'তাই নাকি! তাহলে আমিও আসব।'

'কোনও দরকার নেই। মামুলি পুলিশ রাখবেন।'

'সে কি ক'রে হয়? আমি আসবই।'

আমি জানি ওরা সবাই আসবে এস. পি. থেকে সদর থানার ও. সি. পর্যন্ত, সাদা পোশাকে, যদিও সাহিত্য শব্দটি ওদের প্রত্যেকের পেট থেকে হাই টেনে বার ক'রে নিয়ে আসে, এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেট যে সাহিত্যের ভান ক'রে আসলে কলকাতার এক দুর্ধর্ষ কমিউনিস্টের ওপর (যার নামটাও ওরা জানে না) নজর রাখবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন এ বিষয়ে ওরা প্রত্যেকে নিঃসন্দেহ।

আমিও করেছি, ক'রে থাকি, যা এরা করেছে, করছে করবে। আমার কর্মজীবনে এমন কখনও হয় নি যে ওপরিওয়ালা দ্বারা অলংকৃত সভায় আমি উপস্থিত থাকি নি।

আমরা যারা এই বিরাট দেশটার শাসন চালাই, হয় কেন্দ্রীয় নয় রাজ্য সেক্রেটারিয়েটে, নয়তো জিলায় জিলায়, আমাদের প্রশিক্ষণের পাকাপোক্ত প্রাচীন ব্যবস্থা প্রতি বছর আরও বলশালী হচ্ছে। যে বিরাট ঐতিহ্যময় উত্তরাধিকার কংগ্রেস নেতারা ইংরেজের কাছ থেকে কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করেছিলেন আমরা তাকে এক দুর্ভেদ্য, দুর্জয় দুর্গে পুনঃনির্মিত ক'রে তুলেছি। এ দুর্গের নাম প্রশাসন। প্রহরী আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের আমলারা। ত্রিবর্ণ পতাকা উঠছে দুর্গের স্তম্ভে স্তম্ভে; দুর্গের অভ্যন্তরে এখনও সেই ঔপনিবেশিক সনাতন ভারতবর্ষ। তাকে রক্ষা করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের।

কোনও একদিন, বুঝি কোনও প্রাগৈতিহাসিক অরুণাভ প্রভাতে, নীলাচল ধর নামে একটি সনাতন জাতক মাতোয়ারা স্বপ্ন দেখেছিল এই

দুর্গকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন সমাজ গড়বার। স্বপ্নে সে দেখতে পেয়েছিল প্রবঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের বিপ্লব জয়ধ্বনি তুলছে দিক-দিগন্তে, কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজের পথ মিশে গেছে সাংহাই-চুংকিং-মস্কোর সঙ্গে।

সেই নীলাচল ধর আমি নই।

আমি এখন দুর্গ-রক্ষক। এ দুর্গ এখনও দুর্জেয়। আরও বহু, বহুদিন দুর্জেয়।

মনে পড়ছে দুর্গ-রক্ষণে আমার প্রথম প্রশিক্ষণের কয়েকটা ঘটনা।

নতুন আই. এ. এস হয়ে আমার প্রথম পোস্টিং সগর জিলায়। সদর এস. ডি.ও। দিল্লী থেকে ট্রেনে নাগপুর হ'য়ে সগর যাচ্ছি। নাগপুর স্টেশনে খবর পেয়েছি জিলা শাসক অবন্তীনাথ মাথুরও যাচ্ছেন একই ট্রেনে। ট্রেন ছাড়বার আগেই আমি তাঁর কামরায় হাজির হ'য়ে নমস্কার ইত্যাদি জানিয়ে কর্তব্য সাধন করেছি।

অবন্তীনাথ মাথুর ছিপছিপে মিলিটারী ধরনের তিরিক্ষে-মেজাজ মানুষ, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'ইনটেলেকচুয়াল নাকি হে তুমি?'

প্রশ্নটা শোনাল আমার কানে, 'ওহে ছোকরা, তোমার কি কুষ্ঠরোগ আছে না কি?'

আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম, 'না স্যার, একদম না।'

অবন্তীনাথ মাথুর বললেন, 'শুধু একটা কথা মনে রেখো। জিলাতেই কাজ করো আর সেক্রেটারিয়েটে, আমাদের গায়ত্রী মন্ত্র হল : নো প্রব্লেম। আমি জিলা শাসক, তুমি এস. ডি. ও (সদর)। তোমার কাছ থেকে আমার দাবি : নো প্রব্লেম। তোমার নিচে যারা কাজ করবে তাদের কাছে তোমারও ঐ একটাই দাবি। মন্ত্রীরা আমাদের কাছ থেকে কি চান? চান : নো প্রব্লেম। এই দাবিটুকু যদি আদায় ক'রে নিতে পারো এবং পূরণ করতে তুমি সার্থক সিভিল সার্ভেণ্ট।'

সেই একটা কথা আমি মনে রেখে এসেছি, আমাকে মনে রাখানো হয়েছে।

আমার নিচে যারা কাজ করেছে, করছে, তাদেরও আমি সাফ বলে দিয়েছি, কোনও প্রব্লেম যেন না ঘটে। সমস্যা চাই না। শান্তি চাই। শৃঙ্খলা চাই।

অবশ্য, 'নো-প্রব্লেম' সমাজ-ও-রাজনীতি দর্শনের প্রকৃত রহস্য বুঝে নিতে আমার কিছু সময় লেগেছিল।

সময় লেগেছিল বুঝতে যে মালগুজার যখন জমি থেকে রায়তদের উৎখাত করে তখন কোনও সমস্যা হয় না। সমস্যা হয় রায়ত যদি বাধ্যতার সঙ্গে উৎখাত না মেনে নেয়।

মালগুজারের নায়েব পাইকরা যদি হরিজন যুবতীদের জোর ক'রে উপভোগ করে, তাতে সমস্যা তৈরী হয় না। তৈরী হয়, যদি হরিজনরা রুখে দাঁড়ায়, নায়েব পাইকদের শাস্তি চায়।

কারখানার মালিক যদি শ্রমিক ছাঁটাই ক'রে দেয়, কারখানা বন্ধ ক'রে দেয়, বোনাস দিতে রাজী না হয় তাতে কোনও প্রব্লেম নেই। প্রব্লেম তৈরী হয় যখন শ্রমিকরা ধর্মঘট, মিছিল, প্রতিবাদ, দাবি, পিকেটিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ ক'রে বসে।

এক কথায়, যার আছে সে যা-আছে তা রাখতে চাইবে, তাকে বাড়াতে চাইবে—তা সে সম্পত্তি হোক, বিত্ত হোক অথবা ক্ষমতা, প্রভাব, দাপট—তাতে কোনও সমস্যা নেই, তা স্বাভাবিক এবং অনুমোদিত। যার নেই সে চাইলে সমস্যার সৃষ্টি। জোর ক'রে আদায় করলে, সংকট।

বছর তিনেক আগে এ প্রদেশে জমিদারী প্রথা 'বিলুপ্তি'র আইন হল। সি. পি. অ্যাণ্ড বেরারের ভূমিব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ থেকে একেবারে পৃথক। এখানকার জমিদারদের বলা হয় মালগুজার। মালগুজাররা সরকারকে খাজনা দেয় প্রজাদের কাজ থেকে খাজনা আদায় করে। ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয়, কয়েক বছর পর পর মালগুজারিকে নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ করতে হয়, যদিও বাস্তবক্ষেত্রে, জমির হাত-বদল খুব একটা হয় না। একদিকে যেমন মালগুজার, অন্যদিকে অনেক রায়ত আছে

যারা সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেয়—তারা মাঝারি ও ছোট ভূস্বামী। এ প্রদেশের বৃহত্তম প্রাকৃতিক সম্পদ হল বন-অরণ্য। বিস্তীর্ণ অরণ্যের দীর্ঘ-মেয়াদী ইজারা রয়েছে মালগুজারদের হাতে।

নতুন আইনে মালগুজারদের জমির ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়া হল, তার বাইরে জমির মালিকানা বেআইনী।

আমি তখন ভাণ্ডারার জিলা শাসক।

জিলার সদরে ও মহকুমায় নতুনভাবে জমি রেজিস্ট্রির ধুম পড়ে গেল। কিন্তু, কী আশ্চর্য, একটা বিবাদ নেই, নেই একটি সংঘাত। এমন এক প্রাচীন ভূমিব্যবস্থা আইন ক'রে বদলে দেওয়া হল, কিন্তু কোনও বিবাদ বিসংবাদের চিহ্ন দেখা গেল না।

শুধু সরকারের তহবিলে অনেক রাজস্ব জমা পড়ল, তারও চেয়ে বুঝি বেশি রেভিনিউ স্ট্যাম্পের দলিলের মূল্য। আর ভূমি-রাজস্ব ও রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের কর্মচারীদের হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেল।

এই সময় একদিন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভাণ্ডারা সফরে এলেন। মালগুজাররা তাঁকে জমকালো রিসেপশন দিল। পঁচিশ লক্ষ টাকার একটি তোড়া উপহার দিল। সোনার ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র দিল। মুখ্যমন্ত্রী পঁচিশ লক্ষ টাকা কংগ্রেসের কাজে ব্যয় করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অর্থাৎ তাঁর পুত্রদের দ্রুত স্ফীতমান ভাণ্ডারে পঁচিশ লক্ষ টাকা সংযুক্ত হল।

প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় বসে মুখ্যমন্ত্রী হৃষ্টচিত্তে উদার কণ্ঠে বললেন, 'কী এক বিরাট শান্তিপূর্ণ বিপ্লবই না ঘটে গেল এই রাজ্যে! এত বছরের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার হল। মহাত্মাজি বেঁচে থাকলে কী আনন্দই না পেতেন।'

আমার বলা উচিত ছিল 'নিশ্চয় নিশ্চয়,' কিন্তু গলা দিয়ে ঐ ধরনের পরিতৃপ্তির শব্দ কিছুতেই নির্গত হল না, আমি বড় জোর নিজেকে নীরব রাখতে পারলাম।

মুখ্যমন্ত্রীরা সাধারণত বোকা লোক নন, যদিও অনেক সময় তাঁদের

কাজকর্ম কথাবার্তা বোকা বোকা দেখায় বা শোনায়। আমার মুখ্যমন্ত্রীও একেবারেই বোকা মানুষ ছিলেন না।

আমাকে নীরব দেখে তিনি বললেন, 'জানি, মিঃ ধর, আপনি বলবেন, মালিকানা তো যা ছিল তাই রয়ে গেল।'

এবার আমি বলে উঠলাম, 'কাগজপত্রে কিন্তু তা নয়।'

'জানি, জানি। যার এক হাজার বিঘে জমি নিজের নামে ছিল এখন সে সেই জমিকে দশজনের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, এমন কি বেনামী ভৃত্য পর্যন্ত এখন জমির মালিক। তাতে কি কিছু খারাপ হ'য়েছে? আমরা তো তাই চেয়েছিলাম। আমরা মালিকানাকে অল্প সংখ্যার হাত থেকে বার ক'রে নিয়ে বহু-সংখ্যার হাতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এবং তাই দিয়েছি। মালগুজার পরিবার-গুলি এখন সামন্ততান্ত্রিক না থেকে গণতান্ত্রিক হ'য়ে গেল। ভূমির মালিক এখন আর কেবল পিতা নয়, পুত্রেরাও, স্ত্রীদেরও, এখন ভূসম্পত্তি হল। এটা কি বিপ্লব না? যারা ভূমিহীন তারা ভূমি পেলেই কি সমস্যার শেষ হত? তা তো হতই না, অনেক নতুন সমস্যার শুরু হত, বুঝলেন? তাদের অর্থ দিতে হত, চাষের যন্ত্রপাতি, মূলধন দিতে হত, সে সব অনেক ঝামেলা, আর রাজভাণ্ডারের সাধ্যের বাইরে। এবার বুঝতে পেরেছেন?'

খুব ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম তখন থেকে। সমাজের রসদগুলি যাদের জিম্মায় ও অধিকারে আছে তারাই মালিকানা ক'রে যাবে, এবং তাতেই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, তাতেই মহাত্মা গান্ধীর আত্মার পরিতৃপ্তি, মুখ্য-মন্ত্রীদের পুত্ররাশির ভবিষ্যৎ সুনির্মিত, তাতেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভারতবর্ষের বিকাশ, অগ্রগতি ও প্রশান্তি।

দু-বছর আগে প্রাদেশিক সরকার বন-অরণ্যের ইজারার হার দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমার কিছুটা হাত ছিল। নামমাত্র ইজারা মূল্য দিয়ে যুগের পর যুগ মালগুজাররা এ প্রদেশের বনসম্পদের অনেকখানি অংশ ভোগ ক'রে আসছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের

শাল-সেগুন ইত্যাদি কাঠ ভারতবর্ষের সর্বত্র আদৃত। মালগুজাররা বন-সম্পদ থেকে মুনাফা লুটছে বিস্তর, কিন্তু রাজস্ব দিচ্ছে নামমাত্র।

এ বিষয় নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরী ক'রে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিলাম। তিনি রিপোর্টের তারিফ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমার রিপোর্ট ভিত্তি ক'রে বন-সম্পদের রাজস্ব অন্তত তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের এবং আমার রিপোর্টের খবরটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত সাংবাদিকদের ব'লে দিয়েছিলেন।

তার নতিজা কি হ'য়েছিল? মালগুজাররা বনসম্পদের ইজারা হারাবার ভয়ে মন্ত্রীদের ও মন্ত্রীপুত্র ভ্রাতা সেবকদের কুল্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছিল।

এবং বনে বনে রাহাজানি ক'রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গাছ রাতারাতি বিক্রি ক'রে দিয়েছিল ব্যবসায়ীদের কাছে। এক বীভৎস লুট-তরাজ হ'য়ে গিয়েছিল প্রদেশের অরণ্যসম্পদের। যা নিয়ে কোনও সংবাদপত্র এক লাইন 'সংবাদ' পরিবেশন করে নি, বিধানসভা অথবা সংসদে একটি প্রশ্ন ওঠে নি, অসংখ্য পশুপক্ষী ছাড়া কোনও জীব অথবা দেবতার নিদ্রা ও বিশ্রামের বিন্দুমাত্র হানি হয় নি।

তহসিলদারদের আদালতে প্রায়ই পুলিস এনে হাজির করে বন-সম্পদ অপহরণের অভিযোগে ধৃত গরীব গ্রামবাসীদের। তারা জঙ্গলের শুকনো কাঠ কুড়িয়ে, কখনও-বা দু একটা গাছ কেটে ধরা পড়ে, পুলিসের হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে রেহাই পায়। মাঝে মাঝে পুলিসদের দেখাতে হয় তারা জঙ্গলের সম্পদ রক্ষা করছে। তখন তারা এই সব চোরদের ধ'রে এনে আদালতে দাঁড় করায়। বিচারক এদের শাস্তি দেন। জরিমানা দেবার ক্ষমতা থাকে না, তাই চোরেরা জেলে যায়।

দ্রুগ জিলার প্রশাসন দায়িত্ব যখন আমার হাতে, তখন আমি এক বনসম্পদ লুঠের ঘটনার মুখোমুখি এসে পড়ি। জিলা ফরেস্ট অফিসর রিপোর্ট পাঠান যে বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চলে হাজার হাজার গাছ প্রতিদিন

কেটে ফেলা হচ্ছে। যারা কাটছে তাদের প্রশ্ন করলে জবাব পাওয়া যাচ্ছে তারা রাও বাহাদুর সতীশচন্দ্র সুখমলের লোক। জবাবে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে রেঞ্জার গাছ কাটা বন্ধ করবার আদেশ দিয়ে দেন। দুদিন পরে রাও বাহাদুর সতীশচন্দ্র সুখমলের নিজস্ব রক্ষী বাহিনীর দশজন বন্দুকধারী সিপাহী নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে পঞ্চাশজন লোককে দিয়ে দিনের পর দিন গাছ কাটায়।

ঘটনাটা গুরুতর সন্দেহ নেই। 'নো প্রব্লেম' বলে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

রাও বাহাদুর সতীশচন্দ্র সুখমল সাধারণ ব্যক্তি নন। একই সঙ্গে তিনি অনেক। তিনি এই প্রদেশের অন্যতম প্রধান কাষ্ঠ ব্যবসায়ী। কুড়িজন বৃহত্তম মালগুজারদের একজন। বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য। সি. পি. অ্যাণ্ড বেরার চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি। দ্রুগ জিলা পরিষদের সভাপতি। মুখ্যমন্ত্রীর বৈবাহিক।

তথাপি কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে আমার ডেকে পাঠাতে হল।

রাও বাহাদুর সতীশচন্দ্র সুখমল প্রমুখ ব্যক্তিদের একটা মস্ত বড় গুণ হল, তাঁরা ক্ষমতাপন্ন মানুষের কাছে অতিশয় বিনম্র। আমার তলব পেতেই ছুটে এলেন। বাড়িতে নয়, কাছারিতে। মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হল ব'লে একটুও চটলেন না। আপিসে ঘরে ঢুকেই জোড় হাতে নতমস্তকে নমস্তে জানালেন এবং নিবেদন করলেন যে বহুদিন পরে আমার দর্শন লাভ ক'রে তিনি যেমন আনন্দিত তেমনি বাধিত। এখন আমি শুধু বললেই হয় তিনি আমার কি সেবায় আসতে পারেন।

আমার কাছে ঘটনার বিবরণ ও অভিযোগ শুনে রাও বাহাদুর সতীশচন্দ্র সুখমল আকাশ থেকে পড়লেন। একেবারে মিথ্যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে অরণ্যের রেঞ্জার। লোকটা ভীষণ শয়তান, জঙ্গলে গ্রামের মেয়েগুলিকে ধ'রে ধ'রে ধর্ষণ করে। রাও বাহাদুরের লোকেরা ওকে ঘুষ না দেবার জন্যে চটে মটে আগাগোড়া মিথ্যে লাগিয়েছে। রাও

বাহাদুর সম্পূর্ণ আইনতভাবে অরণ্যের গাছ বিক্রি ক'রে দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের, প্রতি বছরই ক'রে থাকেন। এ বছর অনেক বেশি গাছ বিক্রি করেছেন এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে, ইচ্ছে হয় তো জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে গিয়ে গুণে দেখতে পারেন। রেঞ্জারের লোক তাঁর লোকেদের আদৌ বাধা দেয় নি, তিনি কোনও বন্দুকধারীকে অরণ্যে পাঠান নি, গাছ কাটা নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হ'য়েছে, এ নিয়ে আমার মাথাব্যথার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে নি। রাও বাহাদুর দায়িত্ব-সম্পন্ন নাগরিক, তিনি কংগ্রেসী এম-এল-এ, এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নিকটতম আত্মীয়, অতএব আমার মত সামান্য জিলা শাসক তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। বনসম্পদ নিঃশেষ হ'য়ে গেলে প্রদেশের কত যে ক্ষতি হবে তা তাঁর চেয়ে আমি নিশ্চয় বেশি বুঝি নে, তিনি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা, আমি আজ আছি, কাল নেই, তাঁর হাতে বনসম্পদ চিরকাল যেমন নিরাপদ থেকে গেছে, এখনও আছে তেমনি, শুধু গোলমাল ক'রে বসেছেন নাগপুরের সরকার, ইজারার কর বৃদ্ধি ক'রে। বেশি কর দিতে হলে বেশি গাছ বেচতে হবে, এ তো অতি সোজা কথা।

কথাটা খুবই সোজা এবং সরল।

মালিক যখন লুঠ করে তখন তাকে চুরি বলা হয় না।

॥ চার ॥

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাটা যে একটা বড় রকমের ফাঁকি, 'বিপ্লবী' কবি শরৎ মিত্র তা বুঝল না, কিংবা বুঝেও বুঝতে চাইল না। দ্বিতীয়টাই ঠিক। মানুষ মিথ্যে ছাড়া বাঁচতে পারে না। মিথ্যেকে সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দরী কুমারী ক'রে নেয় মানুষ, তার নাম দেয় স্বপ্ন অথবা কল্পনা অথবা আশা। কুমারী যে সাজানো গোছানো পুতুল ছাড়া কিছু নয় মানুষ তা

মানতে পারে না, মানলে জীবন তার কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, মুদ্রণযন্ত্র মানুষ ও তার পরিবেশকে কী-ভাবে বদলে দিয়েছে তাও আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষ ভেবে দেখে না। মুদ্রণযন্ত্র তৈরী করেছে পাবলিক, অর্থাৎ জনসাধারণ, তার অস্তিত্ব ছিল না বহু-মুদ্রিত সংবাদপত্র ও পুস্তকশিল্পের আগে। মানুষ এখন আর ব্যক্তি নয়, সে অনেকের অণু অংশ মাত্র, বহুর সঙ্গে এখন সে একই সময়ে সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন। রামায়ণ, মহাভারত এমন কি হোমারের 'ইলিয়ড' মহাকাব্য মুখে মুখে রচিত হয়েছিল, লিখিত হবার পরেও বহু শত বছর তারা মুদ্রিত হ'তে পারে নি। বহু লোক রামায়ণ মহাভারত মুখে মুখে শুনলেও এই দুই মহাকাব্য কোনও পাবলিক তৈরী করতে পারে নি, যেমন পারে নি ইলিয়ড, আর যেমন পেরেছে মুদ্রণযন্ত্র। এবং এখন, এই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষ ভাগে, ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশেও চালু হ'য়েছে বৈদ্যুতিক জনসংযোগ, যার চলতি নাম বেতার। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমেরিকায় মুদ্রণ মিডিয়ামকে কোণঠাসা করতে শুরু করেছে, ভারতবর্ষে সে অবস্থা আসবার এখনও অনেক দেরি, কিন্তু ইতিমধ্যেই টেলিভিশন প্রবর্তনের দাবি উঠেছে, গ্রামে গ্রামে ট্রানজিসটর রেডিও অনুপ্রবেশ শুরু করেছে। ভারতবর্ষেও তাহলে, এক বিরাট অনিশ্চিত পাবলিক তৈরী হ'তে চলেছে মুদ্রণ ও বিদ্যুৎ মিডিয়ার সম্মিলিত চাপে। পাবলিক তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মাহাত্ম্য কমে আসছে, কমে আসতে বাধ্য। এবং কমে আসছে বলেই এক প্রকাণ্ড শিল্প গ'ড়ে উঠেছে, ব্যক্তিকে নকল মাহাত্ম্যে পাবলিকের চোখে অনেক বড়ো ক'রে দেবার জন্যে। মুদ্রণ ও বিদ্যুৎ মিডিয়াকে এই শিল্পের প্রধান অশ্বশক্তি ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। এ শিল্পীর নান্দিকরা নানা ছলেকৌশলে অহোরাত্রির প্রচেষ্টায় এখন বহুবর্ণের বহু মস্তক ও বহুহস্ত নেতা তৈরী করতে লেগে গিয়েছে। নেতাদের আর মানুষ ক'রে রাখলে চলছে না, তাদের ক'রে তুলতে হচ্ছে মহামানুষ। সাধারণ গুণের সাবানকে যেমন বিজ্ঞাপন কোম্পানী দৈহিক সৌন্দর্যের জাদুর বেশে পাবলিকের কাছে

তুলে ধরছে, নেতাদেরও তেমনি তুলে ধরা হচ্ছে, মুদ্রণ ও বিদ্যুৎ মিডিয়ামের মাধ্যমে, নকল মাহাত্ম্যের রঙচং লাগিয়ে, এক একটি দেবতার ভূমিকায়।

শরৎ মিত্রকে যারা ছাত্র-যুব সভায় ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ করেছিল তারা মুদ্রণ ও বিদ্যুৎ উভয় মিডিয়ারই ব্যবহার ক'রেও তেমন লাভবান হ'তে পারে নি। সংবাদপত্রে সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'য়েছিল, হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হ'য়েছিল শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলে, শরৎ মিত্রের সামনে দু'দুটো মাইক্রোফোন রাখা হ'য়েছিল, যাতে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাশিত বিরাট জনতার প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে পারে, নিয়ন আলোকে সভামঞ্চ আলোকিত করা হ'য়েছিল যাতে বিপ্লবী কবিকে সবাই চোখ ভ'রে দেখতে পায়। কিন্তু, হায়, 'বিপ্লবী' কবির জন্যে পাবলিক এখনও তৈরী হয় নি জব্বলপুরে, তৈরী হয় নি সারা ভারতবর্ষে : হায়, হায়, বিপ্লবের জন্যেই তৈরী হয় নি এখনও পাবলিক এই প্রাচীন উপমহাদেশে। এখানে এখনও তুলসীদাসের দোহা পাঠ শুনতে শত শত মানুষ এসে হাজির হয় সন্ত তুকড়োজি মহারাজের জনসভায় তিল ধরবার স্থান থাকে না, নেহেরুজীর দর্শন পাবার জন্যে দশ ক্রোশ হেঁটে মানুষ আসে, শুধু পেট ভরে একদিন খাবার জন্যে মাথা পিছু দু'টাকা পেলেই হল! শরৎ মিত্রের ভাষণ শুনতে দেড়শ ছাত্রছাত্রী ও সত্তর জন মাঝবয়সী পুরুষ সমবেত হ'য়ে শরৎ মিত্রকে বিশেষ আনন্দিত করেছিল। সে অবশ্যি জানত না যে ঐ সত্তর জন মাঝবয়সী পুরুষ 'সাদা পোশাকে' এ শহরেরই পুলিশ, গোয়েন্দা ও অন্যান্য সরকারী লোক, এদের মধ্যে আছেন এস-পি, এস-ডি ও, ডি-এস-পি সবাই, এবং শরৎ মিত্র কিছুতেই লক্ষ্য করতে চাইল না যে তার বক্তৃতা শোনবার আগ্রহ বাকী দেড়শ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পঁচিশ জনেরও নেই, তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, হাসি-রসিকতা, চেঁচামেচি ক'রেই গেল এবং শরৎ মিত্রও তাদের কাছে একটানা সত্তর মিনিট বক্তৃতা করেই গেল, যখন সে থামল, তখন সত্তর জন মাঝবয়সী পুরুষ এবং জনা ত্রিশেক যুবক অবশিষ্ট থেকে বিপুল করতালি দিয়ে তার ভাষণকে অভিনন্দিত করল।

এই অনুষ্ঠানে আমার ভূমিকাটা আমাকে যথেষ্ট বিব্রত করতে পারত। শরৎ মিত্রকেও, কিন্তু করল না।

শরৎ মিত্র সভাস্থলে উপস্থিত হবার ঠিক দু'মিনিট আগে আমি উপস্থিত হলাম। যে যেখানে ছিল ছুটে এসে আমাকে স্বাগত করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক তাদের মধ্যে উপস্থিত। তাঁরা অবশ্যি শরৎ মিত্র বক্তৃতা করবার আগেই আমার কাছে গদ্‌গদ বিদায় নিলেন। একদল ছাত্রছাত্রী শরৎ মিত্রকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এল ভাইস-চ্যানসেলারের খাস কামরায়—ভি. সি. অবশ্যি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁকে কোনও একটা কাজে দিল্লী যেতে হ'য়েছিল। আমি শরৎ মিত্রকে দেখে যুগপৎ পুলকিত ও চমকিত হলাম। একদা কৃশদেহ এখন মাংসল; এককালের পাতলা পেট এখন টইটম্বুর ভুঁড়ি, একতারা যন্ত্রের লাউয়ের খোলের মত। চুল কোঁকড়া এবং ঝাঁকড়া, কিন্তু অর্ধেক সাদা। গালে মাংসের স্তূপ। ঠোঁটের দু প্রান্তে দুটি ভাঁজ সর্বদা একটুকরো চিরস্থায়ী ভাঙা টুকরো হাসি তৈরী ক'রে রেখেছে। তাকালেই নিঃসন্দেহ হ'তে হয় এই মানুষটি সুখী, সার্থক, আত্মতৃপ্ত, নিজের মহিমায় সম্মোহিত।

দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে গেল। আমি দেখলাম যে মানুষটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, গাঁদা ফুলের মালা তার গলায় শোভা পাচ্ছে যার গেরুয়া বর্ণের কুর্তায় এক সেট সোনার বোতাম এবং পকেটে পার্কার ৭৫, যার মুখে মুদ্রিত একটুকরো অবিনশ্বর হাস্য, এবং দুই নীলচে চোখে সন্তুষ্ট বিদ্রূপ, একে আমি আগে কখনও দেখি নি, এর সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়।

আমি পরিষ্কার পরিশীলিত হিন্দীতে বললাম, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।'

শরৎ মিত্র মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হল। ঠোঁটের চিরস্থায়ী হাস্যটি বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। শুধু চোখের দু'কোণে পুঞ্জীভূত রেখাগুলি ঈষৎ কাঁপল।

'আপনি বাঙালী না ?' শরৎ মিত্র প্রশ্ন করল।

আমি ইংরেজীতে জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়'।

শরৎ মিত্র বলল, 'আমি এক নীলাচল ধরকে চিনতাম। সে আপনি নন।'

আমি হিন্দীতে বললাম, 'না। সে সৌভাগ্যের অধিকারী আমি নই।'

চা এল, জলখাবার। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। শরৎ মিত্র জনসাধারণের 'বিপ্লবী' কবি, অতএব চা খেল, দুটো মিষ্টিও।

আমি বললাম, এখনও হিন্দীতে, 'শুনেছি আপনি কবিতা লেখেন।'

শরৎ মিত্র এবার প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার সঙ্গে আমার তিন-পীস দামী স্যুটের ওপর নজর রাখল।

বলল, 'গত বছর আমি অ্যাকাদেমী পুরস্কার পেয়েছি। আমার কবিতা পৃথিবীর পনেরটি ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে!'

আমি এবার ইংরেজীতে বললাম, 'তাই না কি? তাহলে তো আপনি বিশ্বকবি। আমি সামান্য জিলা শাসক। কবিতা পাঠের সময় আমাদের হয় না।'

শরৎ মিত্র অবজ্ঞাকে ব্যঙ্গে অনুবাদ ক'রে বলল, 'আমি আপনাদের জন্যে কবিতা লিখি না।'

আমি এবার ধৃষ্টতার সঙ্গে জানতে চাইলাম, 'কাদের জন্যে লেখেন?'

শরৎ মিত্র গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, 'আজ ও আগামী কালের সংগ্রামী মানুষদের জন্যে।'

আমি মুখরতার সঙ্গে সশব্দে অভিভূত হলাম, 'বাঃ বাঃ। এদের নিয়ে এ জিলায় আমার কোনও প্রব্লেম নেই।'

তারপরে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, 'এঁরা আমাকে আপনার সভায় সভাপতিত্ব করতে ডেকে এনেছেন। আমার এ কাজের বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নেই। ধৃষ্টতার জন্য আমি আগে থেকেই আপনার কাছে মার্জনা চেয়ে রাখছি।'

সভাপতির ভাষণও আমি নমোনমো ক'রে সেরে দিলাম। 'আমি প্রশাসন বুঝি। সাহিত্য বোঝবার আমার সময় নেই, যোগ্যতাও নেই। বিশেষ ক'রে আজকের সম্মানিত অতিথির মতো বিপ্লবী কবির বক্তৃতার আগে আমার মতো মানুষের বলবারও কিছু থাকতে পারে না। অবশ্যি তার মানে এই নয় যে আমি বা আমরা বিপ্লব চাই নে। ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধী, জবাহরলাল নেহেরুর প্রদর্শিত পথে 'নীরব বিপ্লবে'র মাধ্যমে অসাধ্যসাধন ক'রে চলেছে, পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যসমাজের ছয় ভাগের এক ভাগকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথে নিয়ে চলেছে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর লক্ষ্যে। সুতরাং আমরা সবাই শুধু বিপ্লবী নই, ভারতের মতো মহান বিপ্লব পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে অর্থাৎ আমি প্রায় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মতোই এক রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে বসলাম, যার পক্ষে একমাত্র বলবার ছিল যে তার স্থায়িত্ব তিন মিনিট সাতাশ সেকেণ্ডের বেশি ছিল না।

শরৎ মিত্র একটানা সত্তর মিনিট বক্তৃতা দিলেন, আগেই বলেছি। তিনি যে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে সশব্দে নিঃসন্দেহ, তার পদধ্বনি শোনবার মতো তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি শ্রোতাদের ছিল না ব'লেই তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, হাসাহাসি, ডাকাডাকি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে একে একে এবং দলে দলে সভাকক্ষ ত্যাগ ক'রে চলে যেতে লাগল। তাতে শরৎ মিত্রের কণ্ঠস্বর তীব্রতর হল, ভাষার ধার বাড়ল, এবং শেষের পঁয়ত্রিশ মিনিট তার বাক্য ও শব্দগুলি বিষাক্ত তীরের মতো আমারই প্রতি নিক্ষিপ্ত হল। তিনি বললেন, 'আমরা যারা বৈজ্ঞানিক পথে বিপ্লবের জন্যে দেশবাসীকে তৈরী করছি, আমরা যারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী-ঐক্যের মাধ্যমে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করছি, আমরাও নির্বাচনী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরাও মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরুকে প্রগতিশীল মনে করি, আমরাও পণ্ডিত নেহেরুর প্রগতিবাদী আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সমর্থন করি, আমরাও আবাদী কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়েছি, আমরা চাই সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বিশেষত সোভিয়েত

য়ুনিয়নের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী ব্যাপক ও গভীর হোক, আমরা পণ্ডিত নেহেরুর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈদেশিক নীতির সমর্থক, দেশপ্রেমে আমরা কারুর চেয়ে কম নই, আমরা চাই নির্বাচনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এবং তার জন্যে কংগ্রেস ও আমরা রাখীবন্ধনে মিলিত, কিন্তু মুশকিল কি জানেন? মুশকিল হল আমলাতন্ত্র, যা কায়েমী-স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ অত্যন্ত বলশালী এবং যা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে বদ্ধপরিকর। এই পরিবেশে, বন্ধুগণ, আজকের সাহিত্যিক ও কবিগণের একমাত্র কর্তব্য হল—কর্তব্য শোনবার জন্যে, আগেই বলেছি, সত্তর জন সাদাপোশাকী পুলিস, গোয়েন্দা ও প্রশাসনিক অফিসের এবং গুটি পঁচিশেক যুবক শেষ পর্যন্ত অসীম ধৈর্য নিয়ে ব'সে রইল। এক সময় শরৎ মিত্র ভাষণ শেষ করলেন, করতালি পড়ল, জনৈক যুবক ধন্যবাদ জানিয়ে দু চারটি কথা বললেন, সভা শেষ হল।

'আপনি দুচারদিন আছেন তো জব্বলপুরে?' শরৎ মিত্রকে আমি প্রশ্ন করলাম।

তিনি তখনও ক্রুদ্ধ এবং আহত। বললেন, 'কাল সকালের গাড়িতে বোম্বে যাচ্ছি।'

'এখানে একটা খুব সুন্দর জলপ্রপাত আছে। আর আছে বিখ্যাত মার্বেল লেক।'

শরৎ মিত্র বললেন, 'ওসব ট্যুরিস্টদের জন্যে।'

আমি বললাম, 'চলুন না আমার বাড়িতে। ওখানেই দু'টি খেয়ে নেবেন।'

শরৎ মিত্র অবাক হ'য়ে আমার মুখে তাকিয়ে রইলেন। আমার কণ্ঠস্বরে বৈরিতার নামলেশ ছিল না। আমি নিজেই চমকে উঠেছিলাম আমার কণ্ঠস্বর শুনে। সে স্বর জিলা শাসক নীলাচল ধরের ছিল না। ছিল অন্য এক নীলাচল ধরের, যার বহু বছর আগে মৃত্যু হয়েছিল।

শরৎ মিত্র একটু ভেবে ব'লে ফেললেন, 'চলুন।'

আমার অধস্তন অফিসররা বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল। গাড়ি শরৎ মিত্র ও আমাকে নিয়ে মিনিট পনেরর মধ্যে আমার বাংলোর ফটকে ঢুকল। এই পনের মিনিট আমাদের মধ্যে বিশেষ কোনও কথা-বার্তা হল না। আমরা দুজনেই বোধ হয় একই সঙ্গে একটা ফাঁকিকে ধ'রে ফেলেছিলাম। কিন্তু একজনও সাহস ক'রে এগিয়ে এসে তাকে হত্যা করার জন্যে তৈরী হ'তে পারি নি।

ড্রয়িংরুমে শরৎ মিত্রকে বসিয়ে আমি অপরাজিতা ধরকে রাত্রের আহারের অতিথির কথা বলবার জন্যে ভেতরে চলে গেলাম। পাঁচ মিনিট পরে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ মিত্র আমাকে আক্রমণ করল।

'সবার সামনে আমাকে চিনতে পারো নি বুঝি চাকরি চলে যাবার ভয়ে ?'

আমি বললাম, 'আমাদের চাকরী অত সহজে যায় না।'

'তবে ?'

'চিনতে পারিনি শুধু একই কারণে। এখনও তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না।'

'কারণটা কি ?'

'তুমি বদলে গেছ।'

'সবাই বদলে যায়। তুমি যাও নি ?'

'আমি তো খোলাখুলিভাবে বদলে গেছি। আমি যে আর সেই কলকাতার নীলাচল ধর নই তা কে না জানে ? তুমি কিন্তু নোটিশ দিয়ে বদলাও নি।'

'বদলে গেছি বলতে তুমি কি বুঝছ, বোঝাতে চাইছ ?'

'তোমার নিজের বদলে-যাওয়াটা বড়ো কথা নয়। তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি পরিবর্তন কতো গভীর ও ব্যাপক। বদলে গেছে তোমাদের পার্টি, তোমাদের আন্দোলন, সব কিছু।'

'পার্টি, আন্দোলন, এসবের কতটুকু খোঁজ রাখ তুমি ! কতটুকু জানো ?'

'তাতে তোমার প্রয়োজন কি ? আমার কথাটা তুমি কিন্তু অস্বীকার করছ না।'

'পার্টির পথ বদলেছে, লক্ষ্য বদলায় নি।'

'পথ ও লক্ষ্য দুটো আলাদা হ'তে পারে না। পথ যদি বদলায়, লক্ষ্য বদলাতে বাধ্য।'

'তুমি এসব এখন আর কিসস্যু বোঝ না। তুমি তো শত্রুশিবিরে গিয়ে ভিড়েছ!'

'তাই নাকি ? নির্বাচনে জিতে তোমরা যদি এ প্রদেশে রাজত্ব করো, আমাদের মাধ্যমেই তোমাদের রাজত্ব করতে হবে না ?'

'তা হ'তে পারে।'

'তাহলে ? তাহলে আমরা তোমাদের শত্রু হলাম কি ক'রে ? তোমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সঙ্গে গলাগলি হয়ে গেছ। তোমাদের সঙ্গে কংগ্রেসের তফাত কি কিছু আছে আর ?'

'নিশ্চয় আছে। চিরদিন থাকবে। আমরা পরস্পরের শ্রেণীশত্রু!'

'মুখেই। তোমাদের বুর্জোয়া হ'তে আর বেশি বাকী নেই।'

'বাজে বোকো না।'

'বাজে বকছি না। তোমরা গান্ধী নেহেরুকে প্রগতিশীল বলে ফেলেছ। বুঝতেও পারছ না বুর্জোয়া রাজনীতি তোমাদের গিলে ফেলেছে। বিধান-সভা বল আর লোকসভা বল, তোমাদের সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেসী সদস্যদের একমাত্র ভাষা ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নেই। ভাষার পার্থক্যও ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। তোমরাও এখন কংগ্রেসের ছোট শরিক হ'য়ে যাচ্ছ। আজ যদি বুঝতে না পারো কাল বুঝবে।'

শরৎ মিত্র এবার ভীষণ রেগে গেল।

'তুমি কি এসব বাজে কথা বলবার জন্যে আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে এসেছ ?'

আমি বললাম, 'এসে যখন পড়েইছ তখন বাজে কথা এক আধটু শুনতে হবে বৈ কি ? কিন্তু তার আগে তুমি যদি কিচ্ছু জানতে চাও

আমার সম্বন্ধে, প্রশ্ন করতে পার। অবশ্যি, আমাকে নিয়ে কৌতূহল তোমার এখনও থাকবে তা আমি আশা করি নে।'

'একটা কৌতূহল আমার এখনও আছে।'

'কি ?'

'তুমি আই-এ-এস পাস করার পর তোমার সেই পুরানো পুলিস রেকর্ড কি ক'রে উধাও হ'য়ে গেল ?'

'তোমার প্রশ্ন হল, পার্টির একদা-মেম্বার হ'য়েও আমি আই-এ-এস পেলাম কি ক'রে ? তাই তো ?'

'তাই।'

'জবাব খুব সহজ। আমার বড়দাদা কলকাতার পুলিস কমিশনারকে বললেন, ছেলেটা ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল ক'রে বসেছিল, এখন খুব অনুতাপ করছে, জানেনই তো আমাদের পরিবারের ইতিহাস, আমরা জন্মেছি শাসন করবার জন্যে, বিপ্লব করবার জন্যে নয়। পুলিস কমিশনার আমার ওপর সদয় হলেন, আমার পুরানো রেকর্ড উধাও হ'য়ে গেল।'

'তুমি কি পুলিসের স্পাই হ'য়ে পার্টিতে ঢুকে পড়ো নি ?'

আমার রক্ত হঠাৎ টগবগ ক'রে ফুটে উঠল। ভীষণ রেগে কুৎসিত কিছু করতেই হবে, তাই আমি গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলাম।

'হাসছ যে !'

'তোমাদের রেট্রোসপেকসনগুলি সত্যি চমৎকার !'

'মানে ?'

'যখন ঘটনা ঘটে তোমরা তা বুঝতে নির্ঘাত ভুল করো। কিন্তু অতীত ঘটনার ব্যাকরণিক বিশ্লেষণে ও পুনর্গঠনে তোমাদের জুড়ি নেই।'

'এমন কোন বিপ্লবী পার্টি নেই যে ভুল করে নি ?'

'এমন কোন বিপ্লবী পার্টি আছে যে কেবল ভুলই ক'রে এসেছে ?'

'আমাদের এখনকার লাইন নির্ভুল।'

'দেখবে কয়েক বছর পরে একথা তোমরা বলবে না।'

'নিশ্চয় বলব।'

'তুমি হয়তো বলবে, অন্যরা বলবে না। তোমরা গণতান্ত্রিকতাকে আলিঙ্গন ক'রে বসেছ। তোমাদের সংগ্রাম নেই। যে দেশের একশ' লোকের মধ্যে নব্বুই জন চাষী, সে দেশে তোমরা গ্রামের গরীবদের নিয়ে সংগঠন করছ না। তোমাদের লক্ষ্য শহুরে ভদ্রলোক আর সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক। তোমরা এখনও অন্ধ নির্ভরতার সঙ্গে মস্কোর দিকে তাকিয়ে আছ। অথচ মস্কো যে তার বৈদেশিক নীতির স্বার্থে তোমাদের ব্যবহার ক'রে যাচ্ছে তা তোমরা বুঝতে পারছ না। অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচনে কি হল ? প্রাভদা প্রাণভ'রে প্রশস্তি করল কংগ্রেসের আর তার জোরে পণ্ডিত নেহেরু তোমাদের নির্বাচনে চুনোপুঁটির মতো বধ করলেন !'

শরৎ মিত্র অবজ্ঞার হাসির সঙ্গে বলল, 'কিন্তু কেরলে ? কেরলে পেরেছে নেহেরু আমাদের রুখতে ? গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে কেরলে ক্ষমতা দখল ক'রে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করি নি ? কেরলে আমরা রাজত্ব করছি না ?

হঠাৎ রক্ত আমার মাথায় চড়ে বসল। আমি গলার স্বরকে সংহত করতে পারলাম না। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বন্ধু, কেরলে তোমরা ক্ষমতা পাও নি। পেয়েছ সরকার গঠনের সাময়িক অধিকার। বন্ধু, কেরলে তোমরা রাজত্ব করছ না। বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রের অনুগত সেবক হ'য়ে শাসন করছ মাত্র !'

শরৎ মিত্রও গলা চড়িয়ে বলল, 'সরকার গড়েছি আমরা শাসন করবার জন্য নয়, বিপ্লবী সংগ্রামকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।'

আমি বললাম, 'যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের সরকারের আয়ু সংক্ষিপ্ত।'

শরৎ মিত্র বলল, 'কেরলে আমাদের সরকার বাঁচবে যতদিন জনসাধারণ থাকবে আমাদের সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'না। ঐ যে নেহেরুকে তোমরা তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিবাদী শক্তিসমূহের সেনাপতিত্বে বরণ ক'রে রেখেছ, সেই নেহেরুই তোমাদের সরকারকে উৎখাত ক'রে দেবে। এবং ঐ যাদের বললে

'জনসাধারণ', তাদেরই সক্রিয় সাহায্য নিয়ে। এবং দেখবে সোভিয়েত রাশিয়া তখনও শ্রীনেহেরুকে প্রগতিবাদীই বলে যাবে, কেননা সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈদেশিক স্বার্থের জন্যে নেহেরুকে তাদের চাই, তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দাম নেহেরুর মস্কোর কাছে।'

অরডারলি এসে খবর দিয়ে গেল, ডিনার প্রস্তুত।

শরৎ মিত্র বলল, 'তুমি যা বোঝো না তাই নিয়ে আবোল-তাবোল বলছ।'

ডিনার টেবিলে শরৎ মিত্র বরফ-চাপা হ'য়ে রইল।

আমি জানি অপরাজিতা বসুকে বিবাহ করা নিয়ে নীলাচল ধর সম্বন্ধে অনেকগুলি কিংবদন্তী কলকাতা শহরে প্রচলিত আছে, অন্তত ছিল।

তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে চালু এবং পুরোপুরি মিথ্যে, তা হল নীলাচল ধর ও অপরাজিতা বসু পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হ'য়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছিল।

এই কিংবদন্তীর নিকটতম জনপ্রিয় এবং অসত্য কিংবদন্তী হল, নিজের ভবিষ্যতের রাজপথ নির্মাণের জন্যে নীলাচল ধর স্বীয় উদ্যোগে অপরাজিতা বসুকে বিবাহ ক'রেছিল।

শরৎ মিত্রও কিংবদন্তীগুলির প্রভাবমুক্ত ছিল না। এখন সে তার কৌতূহল দমন করতে পারল না।

'তোমাদের তো যাকে বলে লাভ-ম্যারেজ, তাই না?' সে প্রশ্ন ক'রে বসল।

আমি বললাম, 'লাভ-ম্যারেজ না ম্যারেড লাভ, এখন সে প্রশ্নটা নিছক গবেষকের প্রশ্ন। যদি কেউ কখনও আমার জীবনী লিখতে চায়, যার সম্ভাবনা মরুভূমিতে জলপ্রপাতের মতোই বিরল, তাকে এ প্রশ্নের জবাব বার করতে হবে, অবশ্যি আমাদের দেশে জীবনীকাররা নায়কদের যৌনজীবন নিয়ে কিছু লেখে না, লিখতে ভয় পায়।'

শরৎ মিত্রের জিহ্বায় তখন অ্যাসিড। সুস্বাদু খাদ্য সে অ্যাসিডকে দূর করতে পারে নি।

'তুমি যে বিয়েটাও ক্যারিয়ারের মাপে দর্জিকে দিয়ে তৈরী করিয়ে নেবে আমরা অতটা ভাবতে পারি নি।'

আমি বললাম, 'ইনসারেকসন থেকে আর্মড পেজেণ্ট রেভল্যুশন থেকে পার্লামেণ্টরী গণতন্ত্রের পথে চলে আসার চেয়েও কি এই ঘটনাটা বেশী অভাবনীয়?'

শরৎ মিত্র বলল, 'পার্টি নিয়ে তোমার সঙ্গে আর একটা কথা বলব না।'

'তাহলে কি নিয়ে বলবে? নীলাচল ধরের বিবাহিত জীবন নিয়ে?'

অপরাজিতা ধর এবার হস্তক্ষেপ করল, 'তুমি ওঁকে এভাবে বিব্রত করছ কেন? আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, শরৎবাবু। একেবারে সাধাসিধে সম্বন্ধ ক'রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। প্রথমবারের স্পেশাল রিক্রুটমেণ্টে আই-এ-এস রেজাল্ড বেরুবার পর আমার বাবা আবিষ্কার ক'রে ফেললেন তাঁর অন্যতম আই-সি-এস বন্ধুর ছোট ভাই সফলদের তালিকাভুক্ত হতে পেরেছে। বাবা তাঁর বন্ধুকে লিখলেন। তার আগে নিশ্চয় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আই-সি-এস এর মেয়ে আমি, ছোটবেলা থেকেই জানি আমার বিয়ে হবে হয় আই-এ-এস নয় আই-আই-টি এনজিনীয়ার নয় লণ্ডনে পাস চার্টার্ড অ্যাকাউ-টেণ্টের সঙ্গে। বয়স নিয়ে তবু আমার একটু খুঁতখুঁত ছিল, আমাদের মধ্যে ন'বছরের তফাত। বাবা বললেন, ওটা কোন আপত্তিরই কারণ হ'তে পারে না, বরং আট নয় বছরের ফারাকটা শেষ পর্যন্ত ভালোই হ'য়ে দাঁড়ায়। এঁর দাদা একদিন মত জানিয়ে চিঠি লিখলেন। বিয়ে হ'য়ে গেল। আপনার বন্ধু আমাকে একবার দেখতেও আসেন নি।'

এখন থেকে শরৎ মিত্র অপরাজিতা ধরের সঙ্গেই বাক্যালাপ ক'রে গেল আহারের সঙ্গে সঙ্গে। অপরাজিতা ধর অবশ্যি শরৎ মিত্রের একটি কবিতাও পড়েনি, কিন্তু তাতে বাক্যালাপ বিঘ্নিত না হ'য়ে বরং সহজতর হল। অপরাজিতা ধর দিল্লীর সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর কন্যা, তার উৎস ও প্রবাহ নিয়ে কবি শরৎ মিত্রের সম্ভ্রমশীল

কৌতূহল আমাকেও নরম ক'রে আনল। শরৎ মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে, এমন কি প্রশ্নের অবকাশ ছাড়াই, অপরাজিতা ধর জানিয়ে দিল নীলাচল ধরের কোনও উচ্চাশা নেই। ক্যাবিনেট সেক্রেটারীকে শ্বশুর হিসেবে পাওয়ার ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বোঝবার ক্ষমতা থেকে সে বঞ্চিত। অনায়াসে যে কোনও দিন সে নিউ দিল্লীর মহাকরণে চলে যেতে পারত, এমন কি ফরেন সার্ভিসও তার অপ্রাপ্য ছিল না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকাকেই সে শ্রেয় ক'রে নিয়েছে, অপরাজিতা ধরের কোনও কথাতেই কান দেয়নি। একমাত্র কন্যা নিবেদিতাকে দিল্লীতে রেখেই কনভেণ্টে পড়াতে হচ্ছে, তাকে তো পাড়াগেঁয়ে অসভ্য অশিক্ষিত ক'রে রাখা যায় না! দিল্লী তো দূরের কথা, নীলাচল ধর প্রাদেশিক মহাকরণেও স্থানান্তরিত হ'তে প্রস্তুত নয়। এমন আই-এ-এস শরৎ মিত্র সারা দেশে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাবে না।

শরৎ মিত্রকে অপরাজিতা ধরের প্রতি সশ্রদ্ধ কৌতূহলী দেখতে পেয়ে আমার মধ্যে যে প্রক্রিয়াটি জোরদার হল তাকে বলা যায় ক্রুদ্ধ সন্তোষ। মানে, আমি একই সঙ্গে রাগতে এবং খুশি হ'তে লাগলাম। শরৎ মিত্র বেশ সচেতন হ'য়ে উঠেছে যে সে যার সঙ্গে বাক্যালাপ করছে, যার গৃহে যার দ্বারা আপ্যায়িত হচ্ছে তার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী। তার হস্টেস যে শরৎ মিত্রের একটি কবিতাও পড়েনি, আসলে হে মোর চিত্ত অথবা পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে ইত্যাদি বাঙালী হয়ে জন্মাবার অবশ্যম্ভাবী শাস্তি কয়েকটি কবিতা ছাড়া কোনও কবিতাই পড়েনি, তাতে শরৎ মিত্রের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। সে উত্তপ্ত উৎসাহের সঙ্গে অপরাজিতা ধরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কবি হলেও শরৎ মিত্র সাধারণ লোক নয়। যদিও সে লোকসভা অথবা রাজ্য-সভার সদস্য নয়, তথাপি অনেক এম. পি. তার বন্ধু, এবং বার কয়েক সে রাষ্ট্রপতি ভবন এবং ত্রিমূর্তি ভবনে নিমন্ত্রিত হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তার পাশে দাঁড়িয়ে একাধিকবার ক্যামেরায় বন্দী হয়েছে। অ্যাকাদেমী পুরস্কারটা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়, শরৎ মিত্র নিবেদিতা ধরকে

নিবেদন করছে, কিন্তু, শত হলেও, দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্যিক সম্মান তো বটে! তা ছাড়া, শরৎ মিত্র বলছে, আমি তো আজকাল দেশে থাকবারই সময় পাই নে, আজ মস্কো, কাল ওয়ারশ, পরশু বুদাপেস্ট, প্রাহা, বার্লিন করতে হয় আমাকে, এবং আমার প্রধান কর্মস্থল এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কায়রো, যেখানে জানেন নিশ্চয়, সোভিয়েত সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে পরাস্ত করার পর, নাসের আফ্রো এশিয়ান লেখক ও শিল্পী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় দপ্তর তৈরী ক'রে দিয়েছেন, আমি এখন এই অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারী। হ্যাঁ, শরৎ মিত্র লণ্ডন রোম প্যারী কোপেনহেগেন স্টকহলম সবই দেখেছে, যদিও তার প্রাণের টান নেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে, 'আমরা দুনিয়ার সর্বহারাদের সেবক।' অপরাজিতা ধর আকৃষ্ট হ'য়ে শুনছে, শরৎ মিত্রের কবিতা দশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং শরৎ মিত্র নিজেও এশিয়া আফ্রিকার চারজন বিপ্লবী কবির কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছে। অপরাজিতা ধরের বদনমণ্ডলে ঘনায়িত ঔদাসীন্যের অন্ধকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শরৎ মিত্র বলে যাচ্ছে, 'আমি তো রাজনৈতিক নেতা নই, আমি কবি, কিন্তু রাজনীতি ও সমাজকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য হ'তে পারে না। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, পণ্ডিত নেহেরু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের ও সহযোগিতার পথ গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাস্তা সুগম ক'রে দিয়েছেন। আমরা এখন পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেসকে পুরো সমর্থন করছি, এবং আমরা বিশ্বাস করি কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সহযোগিতা ভারতবর্ষকে নিও-কলোনিয়ানিজম থেকে সংরক্ষিত রাখবে, আমাদের সমাজকে প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নেবে। সোভিয়েত, চীন আর ভারত একত্র দাঁড়ালে দুনিয়ায় এমন কোনও শক্তি নেই যে আমাদের রুখতে পারে।'

এই সময় আমার অবাধ্য মুখ থেকে একটি প্রশ্ন বেরিয়ে এল, 'যদি তা না হয়?'

শরৎ মিত্র বাধা পেয়ে কুপিত হ'য়ে জানতে চাইল, 'কি না হয় ?'

'সোভিয়েত-চীন-ভারত একসঙ্গে দাঁড়াতে না পারে ?'

শরৎ মিত্রের কুপিততর প্রশ্ন : 'কেন পারবে না।'

'যদি সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় ?'

শরৎ মিত্র ফেটে পড়ল 'অসম্ভব! এ সব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অপপ্রচার।'

আমি পরাজয় না মেনে আবার প্রশ্ন করলাম, 'যদি ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় ?'

শরৎ মিত্র টেবিল চাপড়ে বলল, 'অনেকে তাই চাইছে। দেশে বিদেশে অনেকেরই তাই লক্ষ্য। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু তা কিছুতেই হ'তে দেবেন না।'

আমি বললাম, 'তিব্বতে লামাদের বিদ্রোহ ঘনিয়ে উঠছে, খবর রাখো ?'

শরৎ মিত্র বলল, 'তাতে আমাদের কি ? ওটা চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।'

আমি বললাম, 'আমি যতোটুকু জানি, পণ্ডিত নেহেরু তিব্বতে পুরো-পুরি চীনের কর্তৃত্ব মেনে নেননি।'

'না নিলেও, নিতে হবে,' জোর দিয়ে বলল শরৎ মিত্র।

'নিতে যে একদিন হবেই তাতে আমারও কোনও সন্দেহ নেই,' আমি বললাম, 'কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, তিব্বত নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটতে বাধ্য, এবং তোমাকে প্রশ্ন করছি, যদি তাই ঘটে, তোমরা কার পথ নেবে—পণ্ডিত নেহেরুর না মাও-সে-তুং এর ?'

শরৎ মিত্র গলা উঁচিয়ে বলল, 'এ প্রশ্নটাই ধরিয়ে দিচ্ছে যে তুমি সাম্রাজ্যবাদের দালাল!'

আমিও এবার রেগে গেলাম।

'তাহলে আরও একটা প্রশ্ন তোমাকে করছি : আমার ধারণা

সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে শীঘ্রই এক দারুণ বিবাদ শুরু হ'য়ে যাবে। তখন তোমরা কার পথ নেবে? ক্রুশ্চেভের না মাও-সে-তুং-এর?'

আমার প্রশ্ন শরৎ মিত্রকে পাথর ক'রে দিল।

আমি তার সুযোগ নিয়ে বলে গেলাম, 'তুমি তো রাজনীতি বোঝ না, তুমি কবি, তোমার সঙ্গে গূঢ় মার্কসিস্ট আলোচনাও করা যাবে না। কিন্তু আমি যা বলছি শুনে নাও, অদূর ভবিষ্যতে মনে পড়বে। পার্লামেণ্টারী রাজনীতিকে আলিঙ্গন ক'রে তোমরা ভদ্রলোক হ'য়ে যাচ্ছ। তোমরা এখন নির্ভর ক'রে বসে আছ মস্কোর ওপর। নিজেদের বিপ্লবী শক্তির ওপর তোমাদের ভরসা নেই। তোমরা নেহেরুর লেজুড় হ'তে চলেছ। কাল যদি রাশিয়া ও চীনে বিরোধ লেগে যায় তোমরা চীনকে ত্যাগ ক'রে রাশিয়ার পেছনে দাঁড়াবে। আর যদি ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘাত হয় জাতীয়তাবাদে তোমরা কংগ্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেহেরুকে সমর্থন করবে। অন্তত আমি অবাক হবো না যদি দেখি তুমি তখন জাতীয়তা-বাদী কবিতা লিখছ, আর কমরেডরা দলে দলে বন্দুক হাতে চীনা 'আক্রমণ' থেকে সীমান্ত রক্ষার জন্যে শামিল হ'য়েছে। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে নেহেরুরা যতোটুকু স্বাধীন হ'তে পেরেছে তোমরা ততোটুকুও স্বাধীন হ'তে পারো নি। স্বাধীন না হ'য়ে বিপ্লব করা যায় না। মাও-সে-তুং যদি সোভিয়েত-নির্ভর হ'তেন, চীনে কোনও দিন বিপ্লব হ'ত না।'

শরৎ মিত্র এতক্ষণে বলতে পারল, 'তোমার কাছ থেকে এসব আজে-বাজে কথা শোনবার সময় আমার নেই।'

অপরাজিতা ধর কখন যে ডিনার টেবিল থেকে স'রে পড়েছে আমি বা শরৎ মিত্র কেউ টের পাই নি।

আমি বললাম, 'বাজে কথাগুলি অনুগ্রহ ক'রে একটু মনে রেখো। চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি, আমার সঙ্গ আরও দশ মিনিট তোমাকে সহ্য করতে হবে।'

শরৎ মিত্র সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। আমার ও শরৎ মিত্রের দৃষ্টির মধ্যে মিনিট খানেকের জন্যে মল্লযুদ্ধ ঘটে গেল।

হারল না শরৎ মিত্র। হারলাম না আমি।

আমি বললাম, 'যাবার আগে একটু কফি পান করবে?'

শরৎ মিত্র বলল, 'করা যেতে পারে।'

আমি শরৎ মিত্রকে আমার লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলাম।

বাবুর্চিকে বললাম, 'আমাদের কফি নিয়ে এসো।'

॥ পাঁচ ॥

নীলাচল ধরের লাইব্রেরীতে ঢুকে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম।

আমার নজর যে আলমারিটায় প্রথম পড়ল সেটা শুধু মার্কস, লেলিন, স্তালিন ও মাও-সে-তুং-এর বই-এ ঠাসা। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, একমাত্র কমিউনিজমের ওপরই হাজার খানেক বই নীলাচলের লাইব্রেরীতে। তারও চেয়ে আমাকে যা বেশী অবাক করল তা হল চারটে আলমারী ভরতি বাংলা বই-এর সম্ভার।

নীলাচল এগিয়ে এসে একটা আলমারী খুলে চারখানা বই বার করল। বলল, 'যতোদূর জানি তোমার পঞ্চম পুস্তক এখনও প্রকাশিত হয় নি।'

আমি বলে ফেললাম 'এতো সব বই তুমি পেলে কি ক'রে?

নীলাচল ধর বলল, 'টাকা খরচ করলে বই পাওয়া শক্ত হয় না।'

একটু পরে নীলাচল নিজেই বলল, 'বই প'ড়ে আর কতোটুকু জানা যায় বা বোঝা যায়? শুধু ভাবা যায় বই প'ড়ে। মাথায় সব অসম্ভব চিন্তা আর প্রশ্ন আসে। তার এক আধটু নমুনা তো একটু আগেই পেয়ে গেলে।'

'এই সব বই তোমার পড়া?' প্রশ্নটা আমার নিজের কাছেই বোকা-বোকা শোনাল।

'সব না হ'লেও, বেশির ভাগ,' বলল নীলাচল, 'জিলায় কাজ করার এই একটা সুবিধে।'

'কাজকর্ম নেই বুঝি?'

''একেবারে নেই তা নয়। এই রাজ্যে সমস্যা কম, প্রশাসন শান্ত, শাসককুল সুস্থির।'

'অতএব জিলা শাসকের অবসর অফুরন্ত।'

'বই পড়ার মতো অবসর জনৈক জিলা শাসকের আছে।'

আমার নজর পড়ল একটা আলমারিতে, যা সাময়িক পত্রিকায় ঠাসা। দেখতে পেলাম আমাদের পার্টি পত্রিকা বছরের পর বছর বাঁধাই ক'রে আলমারিতে সুরক্ষিত।

আমি আবার বোকা-বোকা প্রশ্ন ক'রে বসলাম, 'তুমি কি এসবও পড়ো নাকি?'

নীলাচল ধর বলল, 'পড়তে দোষ কি?'

'সরকার তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখে না?'

'কে কি পড়ল তাতে আমাদের সরকারের এখনও তেমন মাথাব্যথা নেই। নজরটা কে কি করল তার ওপর। সবল ও দুর্বলের মধ্যে এই প্রদেশে এখনও কোনও সংঘাত নেই। যদি থাকেও, আমি নির্ঘাত সবলের পক্ষ নেব।'

আমি হেসে উঠলাম। হাসির আওয়াজটা টিন বাজবার কর্কশ আওয়াজের মতো শোনাল।

নীলাচল বলল, 'তবে, হ্যাঁ, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে মাটির স্পর্শ বেশি ঘনিষ্ঠ।'

আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও করলাম না। এই লোকটাকে আমার রহস্যময় লাগতে শুরু করেছে, নতুন ক'রে আবার অনেক বছর পরে। ছাত্রকালেও আমি একে কোনওদিন পুরোপুরি চিনে উঠতে পারি নি, এবং না-পারার জন্যেই আকৃষ্ট হ'য়েছি। আজ এ লোকটা আমার কাছে আরও অনেক বেশি অপরিচিত। এখনও আকর্ষণীয়।

'অবশ্যি, মাটির সঙ্গে যোগাযোগটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়,' নীলাচল বলল, 'মাটির রহস্য ও তাৎপর্য বুঝতে পারাটাই হচ্ছে প্রধান কথা।'

এবার আমি বললাম, 'তোমার মতে আমরা ভারতবর্ষের মাটির রহস্য ও তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারি নি, তাই না?'

'তোমার কথাগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু ধার নেই। পেরেছ, এমন দাবি করার মতো গলার জোরও তোমাদের নেই।'

আমি বললাম, 'তোমার সঙ্গে আর এক প্রচণ্ড ঝগড়া করবার ইচ্ছে অনুভব করছি না।'

বাবুর্চি কফি নিয়ে এল। প্রশ্ন করল, কতটা চিনি চাই আমার। কাপে ঢেলে আমাদের দুজনকে কফি পরিবেশন করল। নীলাচল তাকে বলল, 'তুমি এবার যেতে পারো।'

আমি বললাম, 'তোমার মাটির অভিজ্ঞতা এক-আধটু শোনাতে পারো।'

নীলাচল বলল, 'আমরা সারা জিলায় জিলায় শাসন করি, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু তাদেরই যাদের আয়ত্তে আছে বিত্ত, রসদ, ক্ষমতা। তারাই আমাদের কাছে দরবার করতে আসে, আসে দাবি নিয়ে। মালগুজার, মহাজন, ব্যবসায়ী, কারখানার মালিক, নদী অথবা বনের ইজারা-নেওয়া ব্যাপারী, এদের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ। যারা বিত্তহীন, গরীব, দুর্বল, যারা বঞ্চিত, শোষিত উৎপীড়িত, তারা আমাদের কাছে আসে না। তাদের কাছ থেকে সরকার এখনও অনেক দূরে—যদিও মুখে তারা সরকারকে 'মা-বাবা' বলে। সরকার যে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে না, অন্যায় জুলুম থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না, এটা তাদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের মতোই সত্য। তাদের যে বাস্তবের মধ্যে বাস করতে হয় সেখানে সরকার নির্ঘাত প্রতিপক্ষ। দারোগা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারি, তাদের কাছে, মালগুজার-মহাজন-বানিয়া-ব্যাপারীর জাতভাই।'

'এসব কি আমরা জানি না?'

'জানো নিশ্চয়,' নীলাচল বলল, 'কিন্তু বোঝো কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। এ দেশের শতকরা পঁচাশি-নব্বই ভাগ গ্রাম।

দু চারটি প্রদেশ বাদ দিলে বাকী দেশটার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল শাসন করে সরকার নয়, শাসন করে সমাজ। এক একটা জিলায় ক'টাই বা থানা, আর ক'জনই বা পুলিশ? এই জিলাটাই ধরো না কেন? প্রতি ত্রিশ হাজার লোকের জন্যে মাত্র একটি থানা। খুন জখম দাঙ্গা না হ'লে গ্রামের লোক পুলিশের মুখ দেখতে পায় না—তাও ঘটনা বাসি হ'য়ে যাবার পর পুলিশ উদয় হয়। গ্রামগুলিকে শাসনে রাখছে জাত ধর্ম, সংস্কার, ভূমিব্যবস্থা, শোষণ, দারিদ্র্য, দুর্বলতা। এদের শক্তি যে কী ভীষণ, গ্রামে না গেলে বোঝা যায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রামের অধিকাংশ মানুষকে এখনও একেবারেই সরকারের মুখোমুখি আসতে হয় না। তাদের কাছে গভরমেণ্ট মানে মালগুজার, মহাজন, উঁচুজাতের লোকেরা। আমি যখন ট্যুরে যাই, কোনও সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে এসে মুখোমুখি কথা বলবে না···আবেদন নিবেদন যা করবে, সব কিছু উকিল, মোক্তার, স্কুল শিক্ষকের মাধ্যমে। এক টুকরো জমি নিয়ে দুই গেরস্ত চাষীর ঝগড়া, ঝগড়া থেকে মারপিট, অতএব থানা পুলিস। এই জিলারই এক মহকুমায় আমি ট্যুরে গেছি, দুই পক্ষ আমার কাছে মীমাংসার আবেদন নিয়ে হাজির। কিন্তু কোথায় সেই গেরস্ত চাষীরা? তারা ব'সে আছে রাস্তার ওপর, আর আমার কাছে দুই পক্ষের বক্তব্য নিয়ে এসেছে গ্রামেরই প্রাইমারী স্কুলের দুই শিক্ষক। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনারা কেন? আসল লোকেরা কোথায়? দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'হুজুর, আপনার সামনে আসবার মতন স্পর্ধা তাদের নেই।' এই হল তোমাদের জনসাধারণ। তবু তো এরা গেরস্ত চাষী, কিছু সম্পত্তির মালিক। যাদের কিছু নেই তারা নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সচেতন নয়।'

'সব প্রদেশের অবস্থা একরকম নয়,' আমি বললাম, 'কেবল, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ—এসব প্রদেশে জনসাধারণ অনেকখানি সচেতন।'

নীলাচল বলল, 'আমাদের রাজনীতির উপেক্ষিত হল গ্রামের

গরীবরা। কংগ্রেস ভূস্বামীদের সংগঠন করেছে, তাদের সঙ্গে মিতালি ক'রে নিয়েছে। ভূস্বামীরাই উঁচু জাত, তারাই মহাজন বানিয়া, তারাই নির্বাচনের সময় গরীবদের ভোট কুড়িয়ে এনে কংগ্রেসের বাক্সে জমা দিচ্ছে। তোমাদের নজর শহরে মধ্যবিত্ত ও সংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং এ কারণেই তোমরা এখন ধীরে আস্তে ভদ্রলোক হ'য়ে যাচ্ছ।'

'তুমি বলতে চাও আমরা কমিউনিস্টরা কৃষক আন্দোলন করি নি?' করছি না?'

'এককালে কিছু করেছিলে। স্বাধীনতার পর আর করো নি।'

'তেলেঙ্গানা ভুলে গেছ?'

'তেলেঙ্গানার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ চীন নয়। সোভিয়েত রাশিয়াও নয়। এখানে বলশেভিক কায়দায় বিপ্লব হবে না, হ'তে পারে না। চীনের কায়দায়ও নয়। তোমরা তো দু'পথে পা বাড়িয়েই অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়েছিলে। নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে গ্রামের গরীবদের শ্রেণী সংগ্রাম একত্র জুড়ে না দিলে তোমরা বিপ্লবী পরিবর্তনের পথ খুঁজে বার করতে পারবে না।'

আমি এবার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করলাম। এসব তাত্ত্বিক জটাজাল আমাকে সহজে ক্লান্ত করে। আমার কল্পনা হঠাৎ জব্বলপুরের জিলা শাসকের বাংলোর সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গেল। আমি আর এখন শুধু বাঙালী অথবা ভারতীয় কবি নই। আমি শরৎ মিত্র এখন পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কবি। আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল কায়রোর নীল নদ, ঘানার দৃঢ়পেশী কৃষ্ণকায় মানুষ, জাকার্তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল। সুয়েজ যুদ্ধে মিশরের হাতে পরাস্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সমবেত শক্তি, সুকর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রামী সেনানীদের একত্রিত হ'তে, সিংহলে বন্দরনায়কের নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ঘায়েল করে দিয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ জেগে উঠছে, আলজিরিয়ায় আর ভিয়েৎনামে চলছে কৃষক মজদুরের

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র লড়াই, আমি এখন আফ্রো-এশিয়ার সংগ্রামী মানুষের কবি। বাগদাদে সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ আমরা অধিকার ক'রে নিয়েছি, ক্যুবায় চলেছে আমাদের সশস্ত্র অভিযান। নীলাচল ধর বিশ্বের স্রোতধারা থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখছে, তাই তার চোখে আলোক ধরা পড়ছে না। আমার কাছে ভারতবর্ষ একা অথবা একক নয়, বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের অংশীদার। এবং এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই অমিতবিক্রম অপরাজেয় বিপ্লবী শক্তি, যার জনক কার্লমার্কস ও লেনিন, কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে সে শক্তি তৈরী, যার সঙ্গে কবির ভূমিকায় আমি সংযুক্ত। ক্রুশ্চেভ যা বলে দিয়েছেন তাকে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই কারুর, অন্তত আমার।

নীলাচল বুঝি আমার উড্ডীন চিন্তাধারার খোঁজ পেয়ে গেল। হঠাৎ তার মুখে একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ধ্বনিত হ'য়ে আমাকে চমকিত করল।

আমাকে এখন আলোড়িত ক'রে কেবল এক স্বপ্ন।
আমি উঁচু পাহাড়ের শিখরে উঠে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাই আকাশ।
নীচ থেকে ডাকে আমাকে মানুষ, মিছিলের সেই মানুষ।
আমি হাত বাড়িয়ে দি' এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে।
আকাশ আর মানুষকে মিলিয়ে দেবার স্বপ্ন আমাকে আলোড়িত করে।

সে কি স্বপ্ন? না মায়া? না মতিভ্রম?

'তুমি আমার কবিতা মুখস্থ বলছ?' আমি অভিভূত হ'য়ে গেছি নীলাচলের মুখে আবৃত্তি শুনে।

নীলাচল বলল, 'তোমার কবিতা না পড়লে তোমাদের আন্দোলনের মর্ম বুঝবো কি ক'রে?'

আমি কিছু বলতে পারার আগেই নীলাচল বলে গেল, 'রাজনৈতিক লেখায় একটা আন্দোলনের মর্মকথা ফুটে বেরোয় না। আমাদের দেশে বামপন্থী সাহিত্য নেই কেন? তার প্রধান কারণ, বামপন্থী সংগ্রাম

এখনও আমাদের মর্মে প্রবেশ করতে পারে নি। এই যে বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা, যার নাম স্বাধীনতা, যার বয়স একুশ, সেও আমাদের মর্মে ঢুকতে পারে নি এখনও। বসে আছে বসবার ঘরে, অন্যান্য আসবাবের একটি, অন্দরমহলে তার স্থান ক'রে দিতে পারি নি আমরা। তাই স্বাধীনতা নিয়েও বড় কোনও সাহিত্য তৈরী হয় নি। বামপন্থী সংগ্রামী কবি বলতে একমাত্র তোমাকেই বোঝায়, তুমি একটা সংগ্রামের মর্ম কথা বের ক'রে আনতে চেয়েছিলে। তুমি পারো নি, দোষ তোমার এবং তোমার নয়।'

'পারি নি ?'

'এক সময় তুমি কবিতায় চূড়ান্ত বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা করেছিলে। যে সংগ্রাম নেই, যে আগুন জ্বলছে না, তার কাল্পনিক দাহ্যতা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। এখন তোমার কবিতা অনেক বেশি বিদগ্ধ এবং করুণ। তুমি এখন শতচ্ছিন্ন, তোমার কবিতাও। তোমার সংগ্রামী মন পথে পথে মানুষের মিছিল দেখে উল্লসিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তুমি সংশয় ও সন্দেহে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ো, তোমার সামনে এখন আর সহজ কোনও পথ নেই। তোমার জটায় এখন বেদনার আকাশগঙ্গা, তুমি এখন প্রিয়তমার আহ্বানকে জনতার আহ্বান ব'লে ভুল করতে শুরু করেছ। নির্বাচনে তোমার বিশ্বাস নেই, তবু তুমি নির্বাচনকে সংগ্রামী সাজে সাজিয়ে তাকে নিয়ে ছড়া বাঁধছ। তোমার কবিতা যে জঙ্গী শান্তির জয়গান করছে তার সঙ্গে তোমার পাঠকদের কোনও যোগাযোগ নেই। এককালে তুমি শহরে [illegible] বপ্লবী সংগ্রামের হুংকার শুনতে পেতে, এখন তুমি হাটে বন্দরে নরনারীর ডুকরে ডুকরে কাঁদা শুনতে পাও। তুমি যখন এখনও সবাইকে, সব রাম সব রহিমকে, বাঁয়ে চলা আহ্বান জানাও, তুমি বুঝতে পারো না সে আহ্বানে প্রত্যয় নেই, তোমার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি আজ কারুর বুকে তরঙ্গ তোলে না।'

নীলাচল কথাগুলি বলছিল নালিশের ভঙ্গিতে নয়, সে আমার নিন্দা অথবা সমালোচনা করছিল না, তার বাক্যগুলিতে ছিল না কোনও

অভিযোগ, সে শুধু তার বিশ্বাসমতো একটা পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছিল, যে পরিস্থিতির সঙ্গে আমার সংযুক্তিকে নীলাচল সম্ভবত একটু বড়ো ক'রেই দেখছে।

আমি বিস্মিত হলাম যে নীলাচলের কথাগুলি আমাকে ক্রুদ্ধ করল না, আমার অহমিকাকে আঘাত হানল না, বরং আমার মধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব একটা সন্দেহ-বেদনাকে হঠাৎ অঙ্কুরিত ক'রে দিল। একদিন ছিল, আমি তখন সবেমাত্র কবিখ্যাতি কুড়োতে শুরু করেছি, যখন আমাদের অর্থাৎ লেখকদের, সমালোচনার কশাঘাত সহ্য ক'রেই পায়ে পায়ে এগোতে হত। তখন আমার কবি জীবনের প্রথম পর্যায়ে, একাধিক পত্র-পত্রিকায় আমার কবিতা নিয়ে বিরূপ টীকা টিপ্পনী, কিছু সমা-লোচনাও, দেখতে হত। সেদিন এখন বিগত। এখন আমি কেবল স্তুতি আর প্রশংসা কুড়োই, কেননা বাংলা সাহিত্য থেকে সমালোচনার মেজাজটাকে আমরা ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দিয়েছি। এখন কেউ আর আমার নিন্দা করে না লিখিত অক্ষরে, করে কেবল প্রশস্তি। প্রশস্তির প্রধান প্রকাশ এখন বিজ্ঞাপনে, বই-এর বিজ্ঞাপনই এখন একমাত্র পুস্তক-পরিচয়। তাছাড়া, কোনও এক রহস্যময় রসায়ন আমার সঙ্গে বঙ্গের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের সখ্য স্থাপন ক'রে দিয়েছে, আমি এর জন্যে কারুর তাঁবেদারী করি নি, ওরাই বরং এগিয়ে এসে আমার হাতে রাখী পরিয়েছে। তার একটা কারণ হয়তো এই যে বিপ্লবী কবি হ'য়েও আমি অ্যাকাদেমী পুরস্কার পেয়েছি ওবং সবাই বলছে এবার একদিন আমি লেনিন পুরস্কারও পেয়ে যাব। অ্যাকাদেমী পুরস্কার পেলে তোমাকে এসটাব্লিশমেণ্টের অংশীদার হ'তেই হবে, তুমি না চাইলেও ওরাই তোমাকে গলায় মলা পরিয়ে বার বার অভিনন্দন জানিয়ে ওদের সম-পঙ্ক্তিতে আসনে বসিয়ে নেবে। আমি এখন ওদের সংবাদপত্রের সম্মানিত লেখক, প্রবন্ধ ছাপলে ওরা যে অঙ্কের চেক পাঠায় তাতে আমি নিজেই চমকে উঠি।

কিন্তু আমি তো সচেতনভাবে ওদের সঙ্গে মিশতে চাই নি, আমার

কাব্যে কবিতায় আমি আমার প্রত্যয়-বিশ্বাসকে গোঁজামিল দি' নি। তবে কেন নীলাচল ব'লে বসল আমার প্রত্যয়ে আর সেই পূর্বেকার ধার নেই, আমার কবিতার প্রতিশ্রুতি আজ আর কারুর মনে তরঙ্গ তোলে না ?

আমি তো এখনও মানুষের দৃপ্ত মিছিলের দুর্বার স্পর্ধা ঘোষণা করি ;

আমার কবিতা তো এখনও অন্ধকার উস্তিন্ন ক'রে রক্তিম প্রভাতের নিশ্চিত লক্ষ্যের পানে ধাবমান হয় ;

আমি এখনও জানি, মানুষের মিছিলের রাস্তা বন্ধ করতে পারে এমন শক্তি নেই কোনও দমন রাজার ;

আমার কবিতায় তো এখনও নিপীড়িতের চোখের জল বারুদে রূপান্তরিত হয় ;

আমি তো এখন ঘৃণার ধনুকে টেনে ছিলা বেঁধে এগিয়ে চলি লাল টুকটুক দিবসের পথে ;

তবে কেন আমার মনেই সন্দেহ-ব্যথা, কেন আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যয় গর্জনে অসমর্থ ?

তার কারণ কি এই যে কোথাও আমার, আমাদের, অজ্ঞাতে, শুরু হ'য়ে গেছে নিদারুণ কোনও অপচয়, আবার ? আমি কি সত্যিই 'ভদ্রলোক' হ'য়ে গেছি ? নীলাচলের ডায়াগনসিস কি নির্ভুল ? বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের বিষ কি আমরা অমৃতজ্ঞানে পান ক'রে বসেছি ? যে সমাজকে আমূল পরিবর্তন করা আমাদের লক্ষ্য সে সমাজই কি আমাদের আপনার ক'রে নিচ্ছে, নিয়ে ফেলেছে ? দিল্লীর রাজকীয় জৌলুস, রাষ্ট্রপতি ভবনের মাখন-নরম গালিচা এবং সোফা, প্রতি সন্ধ্যায় মন্ত্রীদের পার্টি, সংসদের বাতানুকূল বিতর্ক, ইচ্ছেমতো বিমান-ভ্রমণ, ঘন ঘন বিদেশযাত্রা, মন্ত্রিত্বের আকর্ষণ, ক্ষমতার মাদকতা, মানুষের তোষামোদ, তদ্বির-সুপারিশের মাধ্যমে রুটির টুকরো লাভ, এবং প্রতি পঞ্চম বছরে নির্বাচনী হাওয়ায় বিপ্লবের ঘুড়ি ওড়ানো, এই কি শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনবেদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ? আমি জানি, হয় নি, নীলাচল ধর ভুল

বলছে, আমরা এখনও বিপ্লবের সৈনিক। তবু কেন আমার মনে হঠাৎ এই সন্দেহ-বেদনা ?

সহসা আমি ভীষণ তৃষ্ণার্ত হ'য়ে উঠেছি, এবং আমার বেশ রাগ হচ্ছে যে একজন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আই-ই-এস অফিসর নিমন্ত্রিত অতিথিকে কফি ছাড়া আর কোনও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করছে না।

আমার তৃষ্ণার খবর নীলাচল জানে না। জানলে নিশ্চয় আহারের আগেই পানীয় অফার করত।

এবং বোঝা যাচ্ছে নীলাচল ধর জল, চা, কফি ছাড়া আর কিছু পান করে না।

কিন্তু আমার তৃষ্ণা আমাকে তাড়না করছে, অতএব, আমি বলছি, 'তোমার বাড়িতে পানীয় কিছু নেই ?'

নীলাচল বিস্ময়কে মুহূর্তে গিলে ফেলে বলছে, 'আছে।'

'তাহলে নিয়ে এসো। বড্ড তৃষ্ণা বোধ করছি।'

নীলাচল নিজেই উঠে গিয়ে হুইস্কি, সোডা, বরফ আর গ্লাস নিয়ে এসেছে।

আমি খুশি হ'য়ে দেখছি, ডুয়ারসের ব্রেণ্ডেড স্কচ, একেবারে খাঁটি বিদেশী মাল।

'তুমি খাও না ?'

নীলাচল বলছে, 'বিশেষ না। আমি বুঝতে পারি নি তুমি আজকাল পান ক'রে থাকো।'

'বিদেশে ঘুরে ঘুরে, বুঝলে না ?'

'নিশ্চয়।'

নীলাচল পানীয় তৈরী ক'রে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। নিজেও ছোট্ট একটা তৈরী ক'রে নিয়েছে।

আমার তৃষ্ণা যে কতো গভীর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বুঝতে পেরেছি গ্লাসে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে। একটানে অর্ধেক গ্লাস শেষ ক'রে আমি সশব্দে খুশি ও হাল্কা হ'য়েছি : 'আঃ, এবার বেশ ভালো

লাগছে।' বলবার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের বাকী অধেক আমার গলায় চলে গেছে।

এবার আমি নিজেই পানীয় তৈরী ক'রে নিয়েছি। নীলাচল বড্ড বেশি সোডা এবং খুব কম হুইস্কি ঢেলেছিল।

নীলাচল তার নিজের তরলতম পানীয় খুব ধীরে আস্তে চুষছে।

'আমি যে বুর্জোয়া হ'য়ে গেছি তার আরও একটা প্রমাণ তুমি পেয়ে গেলে!'

নীলাচল বলল, 'মদ্যপান করলেই বুর্জোয়া হয় না।'

'ঠিক কথা। আমিও তাই বলি।'

এবার নীলাচল বলল, 'তবে আমাদের দেশে সাকসেস হ'লেই লোকে মদ্যপান ক'রে থাকে।'

আমার মেজাজ এখন বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।

'সাকসেস? ও, হ্যাঁ, সাকসেস! নিশ্চয়!'

নীলাচল বলছে, 'তুমি বেশ ভালোই পান করতে শিখে গিয়েছ দেখছি। নিজেকে ধ'রে রাখতে পারো তো?'

'খুব, খুব। এক্ষুনি দেখতে পাবে! একটা পুরো বোতলও আমাকে বেহুঁশ করতে পারে না।'

'কবিতা লিখতে গেলে এক-আধটু পান করতেই হয়, তাই না?' নীলাচল আমাকে পরিষ্কার প্রশ্রয় দিচ্ছে।

'এখন হয়। আগে হ'ত না। মনে আছে ছাত্রকালের কথা? তখন কবিতাগুলি নিজে থেকে বেরিয়ে আসত। গাছে গাছে ফুল ফোটার মত। এখন মেজাজ তৈরী করতে না পারলে কবিতা লিখতে পারি নে।'

নীলাচল বলছে, 'মেজাজ তৈরীর জন্যে মদ্য প্রয়োজন।'

'অপরিহার্যও বলতে পারো।' আমি হাসছি। খুব জোরে, প্রাণভরে হাসছি।

নীলাচল প্রশ্ন করছে, 'তুমি তো এখনও বিয়ে করো নি?'

'না, করি নি।'

'কেন করো নি?'

'সবাই যা করে তার অন্তত একটা করবো না ঠিক করেছি; তাই বিবাহ করি নি। ঐ একটা কাজ সবাই ক'রে থাকে।'

আমি আবার প্রাণ খুলে হাসছি।

নীলাচল বলছে, 'সবাই তো আরও অনেক কিছু ক'রে থাকে।'

'আমি চাকরিও করি নি। এখনও করছি না।'

'বিয়ে করলেই চাকরি করতে হ'ত।'

'ঠিক বলেছ। বিয়ে না করবার সেও একটা কারণ।'

আমি আবার প্রাণভ'রে হাসছি।

আমার হাতের চতুর্থ গ্লাস নিঃশেষিত হ'য়েছে। পঞ্চমবার হুইস্কির সঙ্গে আমি আর সোডা মিশ্রিত করি নি। নীলাচল ভয় পাচ্ছে। আমি প্রাণ খুলে হাসছি।

'আমার হঠাৎ মনে পড়েছে, নীলাচলের পারিবারিক জীবনের কিছুই আমি জানতে চেষ্টা করি নি—শুধু তার বিবাহের ইতিহাস ছাড়া।

'তোমার বড়দার সঙ্গে সম্পর্ক আছে তো?'

'আছে বৈ কি? বড়দা তো এখন সুপ্রিম কোর্টের জাসটিস।"

'মা কেমন আছেন?'

'বৃদ্ধা হ'য়েছেন। আছেন ভালোই।'

'তোমার স্ত্রীকে খুব ভালো লাগল।'

'শুনে সুখী হলাম।'

'তোমাদের সন্তান নেই?'

'একটি মেয়ে। দিল্লীতে পড়ছে।'

'তোমার বিবাহিত জীবন নিশ্চয় খুব সুখের।'

'নিশ্চয়।'

'তুমি দিল্লী যেতে চাও না কেন?'

'আমার জিলাতেই ভালো লাগে।'

'তোমার স্ত্রীর তো ভালো লাগে না।'

'না।'

'তাঁর ভালো লাগাটাকেও তো তোমার দেখতে হবে।'

'বিয়ে করলে তুমি অন্তত আমার চেয়ে ভালো স্বামী হবে!'

'তোমার স্ত্রী তো সাধারণ ঘরের মেয়ে নন। একেবারে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর মেয়ে!'

'নিশ্চয়।'

'তোমার শ্বশুর তোমাকে অনেক কিছু ক'রে দিতে পারেন।'

'কি অনেক কিছু?'

'মানে, তুমি তো অনায়াসে ফরেন সার্ভিসে চ'লে যেতে পারো!'

'আমার কোনও আকর্ষণ নেই ফরেন সার্ভিসে!'

'সে কি? তোমার অ্যাম্বাসাডার হ'তে ইচ্ছে করে না?'

'না!'

'অবাক করলে হে তুমি আমাকে।'

এবার নীলাচল আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার ইচ্ছা করে?'

আমি হোঁচট খেল্যাম, 'কি ইচ্ছে করে?'

'অ্যাম্বাসাডার হ'তে?'

'আমি হবো অ্যাম্বাসাডার?'

আমার প্রাণখোলা হাসি থামবার আগেই নীলাচলের পুনরায় প্রশ্ন, 'কেন হবে না?'

'পণ্ডিত নেহেরু আমাকে অ্যাম্বাসাডার করবেন?'

'যদি করেন?'

'করবেন না।'

'যদি করেন? তোমরা তো শত্রুপক্ষ নও!'

'নই?'

'তোমাদের মতে পণ্ডিত নেহেরু তো প্রগতিবাদী।'

'নিশ্চয়। নেহেরু, নাসের, নক্রুমা, সুকর্ণ। প্রগতিশীল তৃতীয় বিশ্বের চার বলিষ্ঠ স্তম্ভ।

'কালের ধোপে একটি স্তম্ভও টিকবে না, দেখে নিও।'

'টিকবে, যদি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত না মেলায়।'

'তুমি যাদের স্তম্ভ বলছ তারা এক একটি খড়ের দেবতা।'

'খড়ের দেবতা হ'তে যাবে কেন?'

'প্রত্যেকে নিজের দেশে রাজতন্ত্র তৈরী করেছে তার মধ্যে প্রগতিশীল সত্তা নেই। সুন্দর সুন্দর শব্দের রং লাগিয়ে তৈরী করেছে এক একটি খড়ের কুটির। কোনওটারই আয়ু বেশি দিন নয়।'

'তোমার দৃষ্টি শুধু বিভ্রান্ত নয়, অত্যন্ত সংকীর্ণ। নাসের কি ক'রে উঠল দেখতে পেলে না?'

'সুয়েজের কথা বলছ?'

'তবে কি?'

'আমি মিশরের কথা ভাবছি।'

'সুয়েজ আর মিশর কি আলাদা?'

'ভীষণ আলাদা। সুয়েজ বর্তমান দশকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রমাণ। মনে রেখো, নাসের আসোয়ান বাঁধ তৈরী করবার জন্যে প্রথমে আমেরিকার দ্বারস্থ হয়েছিল। ডালেস সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সংঘর্ষ বেধে গেল প্রাচীন বৃদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও নবীন বলশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। বুদ্ধি ক'রে নাসের সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে দুই সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হ'য়ে গেল। ইংলণ্ড আর আমেরিকা একসঙ্গে দাঁড়াতে পারলে সুয়েজের ইতিহাস অন্য রকম হত। সোভিয়েত রাশিয়াও নাসেরকে মদৎ দিতে এগিয়ে আসত না।'

'তাতে কি প্রমাণ হল?'

'প্রমাণ হল, তুমি যাদের প্রগতিশীল তৃতীয় বিশ্বের স্তম্ভ বলছ তারা আসলে এমন কিছু স্তম্ভ নয়। নাসের মিশরকে কি ক'রে রেখেছে?

মিলিটারী কি কখনও সমাজতন্ত্র গড়তে পারে? তোমরা একজনকে আসল ব'লে চালাচ্ছ, লোকের মনে ভ্রান্তি সৃষ্টি করছ। তোমাদের সাহস নেই বলবার যে নেহেরু সমাজতন্ত্রের ঝুটা বুলির আড়ালে গ'ড়ে তুলছে একটা জবুথবু সামন্ততান্ত্রিক ধনতন্ত্র, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হ'তে বাধ্য। তোমরা সুকর্ণকে প্রগতিবাদী বলছ, অথচ তোমরা নিশ্চয় জানো, অন্তত তোমাদের জানা উচিত, যে সুকর্ণের প্রশাসন চলছে দুর্নীতির ইনজিনে।'

আমি এখন আর রাগতে পারছি না। আমার চোখের সামনে কায়রোর নীল নদ, সৃষ্টির প্রভাত থেকে প্রবাহিত নীল নদ। নীল নদ পেরিয়ে পিরামিডগুলির গা ঘেঁষে নতুন তৈরী সড়ক দিয়ে আমি চলে গেছি 'সাহারা' উদ্যানে, সেখানে অপূর্ব সুন্দরী মিশরী রমণীর বেলী-ডান্স চলছে, নৃত্যের তালে তালে তরঙ্গ উঠছে হাজার পুরুষের উত্তপ্ত শরীরে। কায়রো থেকে মুহূর্তে আমি চলে গেছি পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ-য়, এই সেই পোল্যাণ্ড যেখানে শোপিন জন্মেছিল তার চিরন্তন সঙ্গীত নিয়ে, এই সেই একমাত্র দেশ যেখানে ১৯১৯ সালে বিখ্যাত পিয়ানো-শিল্পী পাডেরেস্কি প্রধানমন্ত্রী হ'তে পেরেছিল, মাজুরী হ্রদের তীরে আমি দেখতে পাচ্ছি বিকিনি-পরিহিত পোলিশ তরুণীদের। ওয়ারশ শহরের সাঁইত্রিশতলা সংস্কৃতি-প্রাসাদের উচ্চতম মঞ্জিল থেকে আমি পুরো শহরটার আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি, এবং আমার মনে পড়ছে এই বিরাট অট্টালিকা কমরেড স্তালিন পোল্যাণ্ডকে উপহার দিয়েছিলেন মুক্তিসংগ্রাম শেষ হবার পর। আমার চোখের সামনে ভিস্তুলা নদী। ওয়ারশ থেকে মুহূর্তে আমি চলে গেছি মস্কোয়। এই তো সেই লেনিন হিলস, যেখান থেকে একদা নেপোলিয়ন মস্কোকে জ্বলতে দেখেছিল, ভাবতেও পারে নি রাশিয়ার বরফ তার ক্ষমতার কবর। লেনিন হিলসের ওপরে এখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশচুম্বী অট্টালিকা, আমি কবিতা পাঠ করছি একদল উন্মুখ তরুণ তরুণীর সামনে। রাত্রে আমি বিস্মিত আনন্দে তাকিয়ে আছি ক্রেমলিনের উচ্চতম মিনারগুলিতে

প্রজ্বলিত ঘূর্ণায়মান পঞ্চতারকার দিকে, এই সেই রেড স্টার যা বিশ্বের ইতিহাসে সর্বহারার অনিবার্য আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি এঁকে দিয়েছে। পরক্ষণেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বুদাপেস্টের সুন্দরী নীল ডানিয়ুব, যার জল কোথাও ধূসর, কোথাও গভীর নীল, হাঙ্গেরীর যুবতীদের চোখের রং যেমন গভীর নীল। আমি দাঁড়িয়ে আছি ডানিয়ুবের বুকের মধ্যে মুখ লুকানো মার্গারেট দ্বীপে, দেখছি রংবেরং গাঁয়ের পোশাকে বহুরূপী মেয়েদের লোকনৃত্য।

নীলাচল খবর জানে না, আমি জানি, সর্বহারার পৃথিবী আজ কতো বলীয়ান, কতো তার বৈভব, কী অগ্রসর তার জীবন। এই পৃথিবীর নেতৃত্ব করছে সোভিয়েত দেশ, যে আজ সামরিক শক্তিতে আমেরিকার সমকক্ষ। এই পৃথিবীতে শামিল রয়েছে চীন, সমস্ত মনুষ্যজাতির এক চতুর্থাংশ নিয়ে। এই পৃথিবীতে শামিল পূর্ব য়ুরোপের দেশগুলি। এই পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামী মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, ভারতবর্ষ : তৃতীয় বিশ্বের প্রগতিশীল সব দেশ। এককালে আমিও ভাবতাম ভারতবর্ষের সমস্যা ভারতবর্ষেই মেটাতে হবে। কিন্তু এখন আমি জানি, তা নয়, ভারতবর্ষের সমস্যা মেটাবার জন্যে প্রস্তুত সমস্ত সমাজতন্ত্রী পৃথিবী, প্রস্তুত সোভিয়েত দেশ। নীলাচলের বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী কল্পনাই কেবল চিন্তা করতে পারে সোভিয়েত আর চীনের মধ্যে সংঘাতের কথা, অথবা ভারত ও চীনের মধ্যে। যা হ'তে পারে না তা হবার সম্ভাবনা নিয়ে অলস নিষ্কর্ম বুদ্ধিজীবীরা মাথা ঘামায়। নীলাচলকে দেখে আমার কেমন মায়া হচ্ছে, করুণা। ইচ্ছে হচ্ছে ওকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলি, হয়তো লিখে ফেলবও একদিন। আজ আমার চোখের সামনে ফুল ফুটছে, আমি দেখতে পাচ্ছি সারি সারি লক্ষ্মীর পা, তারা এগিয়ে যাচ্ছে, সারা দুনিয়ার কোটি কোটি লক্ষ্মীর পা একসঙ্গে পাঁয়তারা ক'ষে এগিয়ে যাচ্ছে আমার স্বপ্নের রক্তিম প্রভাতের পানে, আঃ, কী গভীর আনন্দ, কী গভীর ঘুম উঠে আসছে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থেকে, চারদিকে ঘুমের কী সুন্দর গন্ধ...

॥ ছয় ॥

ছাব্বিশ বছর বয়সে নীলাচল ধর ম'রে গিয়েছিল। সে মৃত্যু-সংবাদ কেবল নীলাচল ধরই জানত। আর কারুর জানবার প্রয়োজন ছিল না। কথাও ছিল না। এক নীলাচল ধরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর এক নীলাচল ধরের জন্ম হ'য়েছিল। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে বয়স তার ছাব্বিশ। এখন তার বয়স চুয়াল্লিশ। আমি তাকে প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা দেখি, চিনি জানি। সে নীলাচল ধর আমিই।

সেক্সপীয়ার ভুল করে বলেছিলেন, কাপুরুষ বার বার মরে। একই জীবনে একাধিক বার ম'রে যেতে অনেক সাহস লাগে। একবার মরতে সাহসের দরকার নেই। ম'রে গিয়েও আবার বেঁচে থাকতে অনেক, অনেক সাহস দরকার হয়। কারণ যে-নীলাচল ম'রে গেছে সে এখনও প্রেত হ'য়ে বেঁচে আছে আমারই মধ্যে। তাকে কেউ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ ক'রে নি। কেউ তার আত্মার শান্তির জন্যে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেয় নি। তার শবদেহ এবং প্রেতাত্মার ভার বহন ক'রেই এই আমি নীলাচল জীবিত আছি।

মৃত নীলাচলের সঙ্গে জীবিত নীলাচল অনবরত লড়াই ক'রে চলেছে। নীলাচল হার মানতে রাজী নয়। হার মানতে প্রস্তুত নই আমি। মৃত নীলাচল আর জীবিত নীলাচল দেখতে চাইছে শেষ পর্যন্ত কে হারে কার জিৎ হয়।

নীলাচলের শব ও প্রেতাত্মাকে বহন ক'রেই আমি এতদিন আই. এ. এস. পরীক্ষায় বসেছিলাম। নীলাচল চিৎকার ক'রে উঠেছিল : 'খবরদার! ঐ পথে কখনও নয়।' আমি তার চিৎকারকে অগ্রাহ্য ক'রে ঐ পথেই পা বাড়িয়েছিলাম। লিখিত পরীক্ষার ফল কাগজে দেখে মৃত নীলাচল লজ্জায় চুপ হ'য়ে গিয়েছিল। আমি তার লজ্জা দেখে না-হেসে

পারি নি। অবশ্য কেউ হাসতে দেখে নি আমাকে। আই. এ. এস. পাস ক'রেও আমার মুখে হাসি নেই দেখে অনেকে হেসে ফেলেছিল।

মৌখিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষকমণ্ডলীর একজন আমাকে প্রশ্ন ক'রেছিল, 'তোমার ছাত্রজীবনে একটা বড় রকমের ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। দু'বছর তুমি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলে। কেন?'

মৃত নীলাচল আমাকে ঠেলা মেরে বলেছিল, বল্, সত্যি কথা বলে দে।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'আমি প্রায় মনস্থির ক'রে ফেলেছিলাম, রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব। তাই পড়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম।'

মৃত নীলাচল আমার জবাব শুনে মূর্ছা গিয়েছিল।

অন্য একজন পরীক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি সন্ন্যাসী হবার কথা ভেবেছিলে?'

তৃতীয় পরীক্ষক মন্তব্য করেছিলেন, 'হি ডস্ লুক সামহোয়াট লাইক অ' মংক।'

প্রথম পরীক্ষক জানতে চেয়েছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস নিলে না কেন?'

আমি বলেছিলাম 'অনেক ভেবে-চিন্তে মনে হল, সন্ন্যাস নেওয়া মানে জীবনের বাস্তব থেকে পালিয়ে যাওয়া। বিশ্বাস হল, সন্ন্যাস না নিয়েও সন্ন্যাসীর মত জীবন-ধারণ সম্ভব।'

পরীক্ষকরা আর আমাকে প্রশ্ন করেন নি। সফল পরীক্ষার্থীদের তালিকায় নীলাচল ধরের নাম ছিল তৃতীয়।

প্রেতাত্মা নীলাচল সাতরাত্রি আমাকে ঘুমুতে দেয় নি। চোখ বুঝলেই আমি নীলাচল ধরের মরা মুখ দেখতে পেয়েছি।

আমার বড়দা মাননীয় বিচারপতি নীলমাধব ধর পুলিস কমিশনারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। নীলমাধব ধর আর পুলিস কমিশনার সুশীতল ভট্টাচার্য একই বছর যথাক্রমে আই-সি-এস ও আই-পি-এস হ'য়েছিলেন। লালবাজারের গোপন তথ্য-

কেন্দ্র থেকে একটা ফাইল উধাও হ'য়ে গিয়েছিল। ৺নীলাচল ধরের ফাইল।

মৃত নীলাচলের কর্মস্থল থেকে অনেক দূরে চ'লে যাবার উদ্দেশ্যে আমি সি-পি-অ্যাণ্ড বেরার আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিয়েছিলাম। কিন্তু নীলাচলের শব ও প্রেতাত্মা আমার সঙ্গ ছাড়ে নি। তাদের নিয়েই আমি কাজে যোগদান করেছিলাম। তারা এখনও আমার সঙ্গেই আছে।

এক মুহূর্ত আমার সঙ্গ ছাড়ে না।

আমি কাছারিতে ব'সে কাজ করি। মৃত নীলাচল আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতির দাঁত বাঁধানো লাঠি দোলাতে দোলাতে আমার দপ্তর ঘরে প্রবেশ করেন শেঠ ধরমবীর। জিলা কংগ্রেসের সভাপতি, বিধান-সভার কংগ্রেসী এম. এল. এ। আমি উঠে দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা করি। শেঠ ধরমবীর কুশলাদি প্রশ্ন বিনিময়ের পরে তাঁর নিবেদন রাখেন। জব্বলপুর জিলায় চারটি নতুন সড়ক তৈরী করার জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সরকার মঞ্জুর করেছেন। এ কাজের ঠিকেদারীর জন্যে আবেদন করেছে সি. পি. অ্যাণ্ড বেরার ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন। কনট্রাক্টটা যেন তারা পেয়ে যায় আমাকে তা দেখতে হবে।

আমি জানি, সবাই জানে, সি. পি. অ্যাণ্ড বেরার ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশনের আসল মালিক শেঠ ধরমবীর। ম্যানেজিং ডিরেকটার ভদ্র সুপুত্র, শেঠ কিশানচাঁদ।

মৃত নীলাচলের প্রেত আমাকে খোঁচা মারে।

আমি বলি, 'শেঠজি, গত বছরের কনট্রাক্টও তো এরাই পেয়েছিল। কিন্তু কাজ খুব খারাপ হ'য়েছে। রাস্তা না তৈরী ক'রেই বিল পেশ ক'রে টাকা নিয়ে নিয়েছে।'

শেঠ ধরমবীর বলেন, 'ওসব দুষ্ট লোকের মিথ্যে প্রচার। তিনি নিজে যাচাই করে দেখেছেন। ত্রুটি এক-আধটু হ'য়েছে ঠিকই। ভালো মাল মশলা পাওয়া যায় না। ছোট ঠিকেদাররা হরদম চুরি করে।

সরকারী লোকেরা ঘুষ নেয়। তবু যে-সামান্য অবহেলা হ'য়েছে কাজে তা সব ঠিক ক'রে দেওয়া হবে। ধর সাহেব, পি-ডব্লু-ডি মিনিস্টারের সঙ্গে আমার বাতচিত হ'য়ে গেছে। তিনিই আমাকে বলেছেন আপনার কাছে আসতে। ঐ কনট্রাকট কিষাণচাঁদ পাঁচ বছর ধ'রে পেয়ে আসছে। এবারও তাকে পেতেই হবে।'

আমি বলি, 'মন্ত্রী যখন আপনাকে কথা দিয়েছেন তখন আর ভাবনা কি?'

সন্তুষ্ট হ'য়ে শেঠ ধরমবীর বলেন, 'দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে ধর সা'ব, জিনিসপত্রের দাম হু হু ক'রে বাড়ছে, ছোট লোকেরা অবাধ্য হ'য়ে উঠেছে, কাজকর্মে মন নেই, কেবল মজুরি বাড়াও, আনাজ দাও, জমি দাও। হাজার হাজার বছর এ দেশটায় শান্তি ছিল, এবার তা যেতে বসেছে। তবু আমরা সেবা ক'রে যাচ্ছি, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, সেবা ক'রে যা'ব। আমরা গান্ধীর চেলা, ধর সা'ব, আমরা ইংরাজের লাঠি খেয়েছি, জেলে গেছি, স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে তৈয়ার থেকেছি। আপনারা তো মজাসে শাসন ক'রে যাচ্ছেন, হাজার হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন, দেশের জন্যে স্যাক্রিফাইস কাকে ব'লে আপনাদের জানবার কথা নয়।'

নীলাচলের ভূত আমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে বমি ক'রে দিল।

আমি বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করি, 'শেঠজী, আপনার সেই মামলাটা মিটে গেছে তো?'

শেঠ ধরমবীরের বিরুদ্ধে কাঠের ব্যাবসায়ী মোহানলাল যোশী গত বছর ফৌজদারী মামলা ঠুকে দিয়েছিল। শেঠ ধরমবীর মোহনলাল যোশীর বাইশ বছরের বিধবা কন্যাকে ভাগিয়ে নিয়েছিল।

'ওটা কি একটা মামলা ছিল, ধর সাব? নতুন ভুঁইফোড় পয়সাওয়ালা একদল লোক কংগ্রেসের রাজত্বে তৈরী হয়েছে, মোহনলাল যোশীর মতো। পনের বছর আগে মোহনলাল আমার নোকর ছিল, ধর সা'ব। আমাদের বিরাট বন, বহু কালের ইজারা। তাতেই কাজ

করত মোহনলাল। এখন সে লাখ টাকার ব্যাপারী। পুরানো মনিবকে শ্রদ্ধা করা দূরের কথা, কিসে তার ক্ষতি হবে এই এখন মোহন-লালের দিনরাত্রির চিন্তা। ওর মেয়েটা অত্যাচারে নিজের বাপের বাড়িতে টিকতে না পেরে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে—আমি গান্ধীর শিষ্য, একটা বিধবা যুবতীর দুর্দশা দেখলে স্থির থাকতে পারি? আপনিই বলুন, ধর সা'ব! ঐ মামলা কবে ফেঁসে গেছে।'

মৃত নীলাচল খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল।

আমি জানি, শেঠ ধরমবীর দশহাজার টাকা নগদ খয়চ করে মোহন-লাল যোশীকে দিয়েই মামলা তুলে নিয়েছে।

'আমার আর্জিটা মনে রাখবেন, ধর সা'ব, এ নিয়ে যেন আমাকে আর কোনও তকলিফ্ ভোগ করতে না হয়।'

বলা বাহুল্য, সড়কের কনট্রাক্ট্ শেঠ কিষাণচাঁদই পেয়েছিল। না পাবার কোনও কারণ ছিল না। পি-ডব্লু-ডির ইঞ্জিনীয়াররা রিপোর্ট দিয়েছিল গত বছরের রাস্তাগুলি ঠিকঠাক তৈরী হয়ে গেছে। শেঠ কিষাণচাঁদের টেনডারে সর্বোচ্চ কোটেশন থাকলেও তার কাজ নাকি সর্বোত্তম। জিলা শাসক তো আর নিজে গিয়ে রাস্তা নির্মাণের তদারকি করতে পারে না।

মৃত নীলাচল ধরের মুখ ভ্যাংচামি আমার গা সহ্য হয়ে গেছে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে নীলাচল ধর কেন মরে গিয়েছিল? কোন ব্যাধির আক্রমণে তার মৃত্যু অবধারিত হয়ে গেল?

সে ব্যাধির নাম ইনভলব্‌মেণ্ট। জড়িয়ে পড়া। নীলাচল ধর মানুষ, সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইতিহাস ইত্যাদি ভীষণ ভীষণ সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বাস্তবকে না মেনে নিয়ে সে তাকে বদলাবার স্বপ্নে মেতে উঠেছিল। বাস্তব একদিন তার কচি গলা টিপে ধরল। শ্বাস আটকে মরে গেল নীলাচল ধর।

আমি মরে যাইনি, যাচ্ছি না, তার কারণ আমার কোনও ইনভলব্-মেণ্ট নেই। আমি কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি। মানুষ,

সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইতিহাস আমার মনে অথবা মস্তিষ্কে রেখাপাত করতে পারে না। আমি বাস্তবকে মানিও না, অগ্রাহ্যও করি না। বাস্তব আর আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। বাস্তব আছে, আমিও আছি, আমাদের মধ্যে সেতু নেই, যোগাযোগ নেই। আমি বাস্তবকে রাগাতেও চাই নে, বদলাতেও চাই না। লেট লিভ। তুমি থাকো, আমাকে থাকতে দাও।

ছাব্বিশ বছর বয়সে নীলাচল ধর মরে গিয়েছিল কেননা সে খাঁটি আর সাচ্চার প্রলোভনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। সে চেয়েছিল জেনুইননেস—খোলস ছাড়িয়ে সার, মুখোশ খুলে ফেলে আসল রূপ। হাজার হাজার বর্শাধারী মুখোশ তার দেহকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল।

আমি জেনুইননেস থেকে পালিয়ে বেঁচে আছি। খাঁটি আর সাচ্চার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। খোলস আর মুখোশ না হ'লে আমার একদিনও চলে না। আমি কাউকে ন্যাংটো দেখতে চাই না। নিজেকে তো নয়ই।

মুখ্যমন্ত্রী একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'এই যে ভারতবর্ষ, এটা হল সমন্বয়ের মাতৃভূমি। এখানে শ্রেণী সংঘর্ষ নেই, আছে শ্রেণী সমন্বয়। ভারতবর্ষের মাটিতে ঘৃণা, হিংসা, লোভ, ভোগ, এসব বিষবৃক্ষ বাড়তে পারে না। এ দেশের বাতাস মৈত্রীর সঙ্গীত ব'য়ে বেড়ায়। মনে রাখবেন, এ দেশ বুদ্ধ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, গুরুদেবের দেশ।'

মৃত নীলাচল তেড়ে যেতে চেয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর দিকে।

আমি শুধু বলেছিলাম, 'নিশ্চয়।'

ছাব্বিশ বছর বয়সে নীলাচল ধর ম'রে গিয়েছিল কেননা সে স্বাভাবিককে নরমালসিকে, মানতে চায় নি। স্বাভাবিক দৈত্য তার গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছিল।

আমি বেঁচে আছি কেননা আমি স্বাভাবিক দৈত্যকে মেনে নিয়েছি। আমি মেনে নিয়েছি নরমালিটিকে। নরমালিটি মানেই অ্যাবনর-

মালিটি। স্বাভাবিক মানেই অস্বাভাবিক। উচিতের মুখোশ প'রে অনুচিতের আধিপত্য। নরমালিটি মানে করাপ্‌শন। যার কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নেই। বাংলায় আমরা যাকে দুর্নীতি বলি করাপ্‌শনের তা একটা সামান্য অংশ মাত্র। করাপ্‌শন মানে আগাগোড়া পচন। পচনের মুখোশ স্বাস্থ্য।

মুখ্যমন্ত্রীকে মৃত নীলাচল বলতে পারত, 'তুমি ঠক, জোচ্চোর, বদমাশ। তুমি একদিকে 'সেবা' করছ, অন্যদিকে প্রজাদের ধনসম্পদ লুঠ ক'রে কোটিপতি হচ্ছ। তোমার ছেলেরা আত্মীয়েরা যে যত পারে লুঠ ক'রে নিচ্ছে। শুধু তুমি নও, তোমরা সবাই। তোমাদের লোভের সীমা নেই। তোমাদের ভোগেরও পরিতৃপ্তি নেই। তুমি বলছ ভারতবর্ষ সমন্বয়ের দেশ। কিন্তু তুমি জানো, এ দেশের ইতিহাসে ঘৃণা আর হিংসা ছড়িয়ে আছে। এ দেশের মানুষ ঘৃণার হিংসার পাহাড় ব'য়ে চলেছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। যাদের মানুষ ব'লে স্বীকার করি নে আমরা তাদের হৃদয়ে আমাদের জন্যে প্রেম নেই। আছে শুধু ঘৃণা আর হিংসা। আজ তারা নিজেদের আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই সব কিছু সহ্য ক'রে যাচ্ছে। একদিন আসবে, সে দিনের দেরি নেই, যখন তারা নিজেদের আবিষ্কার ক'রে ফেলবে। চমকে উঠবে দেখতে পেয়ে কী ভীষণ ঘৃণা আর হিংসা জমে আছে তাদের রক্তের মধ্যে, তাদের শিরা-উপশিরায়। তখন তোমরা বুঝতে পারবে কতো বিপন্ন তোমাদের এই লুঠ-করা ধনরত্নে ঠাসা দুর্গগুলি।

আমি মুখ্যমন্ত্রীর কথাগুলি শুনে শুধু বলি, 'নিশ্চয়!' তার মানে এই নয় যে আমি তাঁর কথাগুলি সমর্থন করি। আমি কেবল একটা শব্দ উচ্চারণ করে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ ক'রে রাখি। নিজেকে আশ্বস্ত করি যে আমি আছি। সমন্বয়ের মানে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। প্রতি বছর হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়, শত শত লোক মরে, হাজার হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তার নাম সমন্বয়। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ, অশিক্ষিত, অসুস্থ ক'রে

রাখা হয়, তাদের দেহের শ্রম মাটির বুক থেকে যা উৎপন্ন করে তার সিংহভাগ লুঠ ক'রে তৈরী হয় তোমাদের, আমাদের ক্ষমতা, বিত্ত, আরাম। এর নামও সমন্বয়। সম্প্রীতি। সেবা। মন্ত্রীরা হাজার টাকা মাইনে নেন। প্রতি বছর তাঁদের এক একখানা বাড়ি তৈরী হয় বেনামে, জমি বাড়ে, সম্পত্তি বাড়ে, আয়ু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভালো হয়, তাঁরা ইচ্ছেমত পছন্দমত দেহসেবিনী ও শয্যাসঙ্গিনী পেয়ে থাকেন, তাঁদের ক্ষমতা বাড়ে, মন্ত্রিত্ব দীর্ঘজীবী হয়; এর নাম সেবা। মন্ত্রীরা যে পথ দেখান সেই অখণ্ড সেবার পথে চলমান বড়-ছোট-মাঝারি সব রাজনৈতিক নেতা, দিল্লী থেকে সুদূরতম গ্রাম পর্যন্ত। আমলারা প্রশাসন চালায়, ঘুষ নেয়, মন্ত্রীদের অন্যায় হুকুম পালন করে, আত্মীয়দের চাকরিতে বসিয়ে দেয়। জমিদার মালগুজার জোতদার গরীব চাষীর রক্ত চোষে। কারখানার মালিক দুহাতে মুনাফা লোটে আর নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের তহবিলে মোটা টাকা জমা দেয়। সংসদ আর বিধানসভাগুলি আইন তৈরী ক'রে সমাজতন্ত্র বানায়, অস্পৃশ্যতা দূর করে, যৌতুক বেআইনী করে দেয়। এম. পি. আর. এম্. এল. এরা পারমিট লাইসেন্স ইত্যাদির শিকারে হাত পাকায়। বর্ণ হিন্দুরা হরিজনদের পিটিয়ে মারে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, জমিদার জোতদারেরা গরীব চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করে। কারখানার মালিকেরা মজুরি বাড়াবার দাবি উঠলেই লক-আউট ঘোষণা করে। নেতারা ভারতবর্ষের মৌলিক প্রতিভা সমন্বয় সম্প্রীতি সেবার জয়গানে মুখর হন, পনেরই আগস্ট লাল কিলায় ত্রিবর্ণ পতাকা ওঠে, ২৬শে জানুয়ারী ইণ্ডিয়া গেটে বহুরূপী স্বাধীনতা-প্যারেড হয়, পণ্ডিত নেহেরু আইসেনহাওয়ার, জন এফ. কেনেডি, নিকিতা ক্রুশ্চেভ ও চ্যু এন-লাইএর সঙ্গে করমর্দন করেন, পত্র-পত্রিকায় ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি হয়, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র দৃঢ় পদক্ষেপে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলে, একশ জনের মধ্যে পঞ্চান্ন জন ভারতবাসী খেতে পায় না, প্রায়-উলঙ্গ থাকে, সত্তর জন রোগে পড়লে ডাক্তারের মুখ দেখতে পায় না, টাটা-বিড়লা সিংহানিয়ার সাম্রাজ্য টগবগিয়ে বাড়তে থাকে। এরই

নাম করাপ্‌শন। ব্যাপক গভীর পচন। ধারাবাহিক সামগ্রিক পচন। পচনের মুখোশ স্বাস্থ্য। কুৎসিতকে দেখায় সুন্দর। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক।

ছাব্বিশ বছরে মৃত নীলাচল ধর জানত না, চুয়াল্লিশ বছরেও জীবিত আমি যা খুব ভাল ক'রে জেনে নিয়েছি : নরমালিটির সঙ্গে মিতালি ক'রে বেঁচে থাকতে হ'লে কোনও কিছু নিয়ে জড়িয়ে পড়ার জো নেই। নন-ইনভলব্‌মেণ্ট, অতএব, জীবিত ভারতবাসীর জীবনবেদ, নন-ভায়োলেন্সের মতোই সমগ্র জাতির মনুসংহিতা। এ দেশটার মহিমাই হল 'নন'-এর মহিমা : নন-ভায়োলেন্স, নন-অ্যালাইনমেণ্ট, নন-ইনভলব্‌মেণ্ট। মাছ ধরবো কিন্তু হাতে পানি লাগবে না, ভারতবর্ষের মানসিকতার এই হল আসল প্রতিভা। তাই দেশে খাদ্য উৎপাদনের ঝুঁকি মাথায় না নিয়ে পি-এল ৪৮০র শরণ নেওয়া আমাদের পক্ষে অনেক সহজ। এবং সবুজ বিপ্লব যখন এসেই গেল তখন আর লাল বিপ্লব আনবার প্রয়োজন নেই। সমাজতন্ত্র গড়বো কিন্তু বিত্তবানদের বিত্তে হাত দেব না, বরং তা বেড়েই চলবে, চোখ বন্ধ ক'রে কেবল সুবচনীর তুবড়ি ফুটিয়ে সারা দেশকে আলোকিত ক'রে দেব। পাবলিক সেকটর মানেই যে সমাজতন্ত্র নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধনতন্ত্রের অপরিহার্য স্তম্ভ, এই সত্যি কথাটা সাম্যবাদী হ'য়েও কিছুতেই স্বীকার করব না। রাষ্ট্রের মালিক যদি পুঁজিবাদী আর সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী হয় তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা জনসাধারণের স্বার্থ দেখবে কি ক'রে? আর, মস্কো অথবা পিকিং যা বলবে তাকেই যদি বেদবাক্য ব'লে মেনে নি, তা'হলে সামাজিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্ক কষার দায়িত্বটুকু নিশ্চিন্তে এড়িয়ে চলা যায়। খুব সহজেই ভুলে যাওয়া যায় যে মস্কো অথবা পিকিং যা বলে এবং যা করে তার বেশির ভাগই নিজেদের বিশ্বনীতির স্বার্থে। ভারতবর্ষ বা ঘানার বিপ্লবের সঙ্গে সে স্বার্থের মিতালি নাও থাকতে পারে। তা নইলে মস্কো কেন কংগ্রেসী রাজত্বের ওপর প্রগতিশীলতার ফুল চন্দন বর্ষণ করবে, জেনে-শুনেও যে কংগ্রেস এক অতিকায়

শোষণধার্মিক পুঁজিবাদী আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতার পর থেকেই? মস্কো বা পিকিং-এর চোখে যা প্রগতিশীল, তুমি ভারতীয় সাম্যবাদী, তোমার চোখেও তা প্রগতিশীল হ'তেই হবে এমন বাধ্যতার মধ্যে তোমার স্বকীয় স্বাধীনতা কতটুকু বাড়তে পারে?

এই ধরনের অনেক, অনেক প্রশ্ন আছে যা তুলতে গেলেই ভীষণ বিপদ! তাহলেই জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলেই আর নির্লিপ্ততা অর্জন করা সম্ভব হ'তে পারে না। আমি নির্লিপ্ততাকে বরণ ক'রে নিয়ে বছরের পর বছর মোহমুক্ত অনাকৃষ্ট জীবন যাপন ক'রে যেতে পারি, যা ছাব্বিশ বছরে ম'রে যাওয়া নীলাচল ধর পারে নি, পারলে তাকে মরতে হ'ত না।

বিবাহ, সন্তান, সংসার : এরাও আমার নির্লিপ্ততাকে আক্রমণ করতে পারে নি।

যে নীলাচল ধর ছাব্বিশ বছরে ম'রে গেল তার জীবনে কোনও নারীর উত্তাপ আসতে পারে নি। ৺নীলাচল ধর কোনও মেয়েকে ভালোবাসা দূরের কথা, কারুর সঙ্গে মামুলি আলাপের চেয়ে এক-পা এগোতে পারে নি।

তার প্রধান কারণ ছিল ৺নীলাচল ধরের আত্মপ্রেম। নিজেকে নিয়ে সে মশগুল ছিল। এবং ঠিক যে সন্ধিবয়সে তার আত্মরতিতে ভাঙন ধরতে শুরু করল তখুনি সে পেয়ে গেল আকাশ-ছোঁওয়া এক আদর্শ আর পার্টি নামক এক কঠিন নির্দয় গুরু, যার কাছে নিজের সবটুকু সত্তাকে সমর্পণ ক'রে ৺নীলাচল ধর মুক্ত-পুরুষ হল।

তথাপি, সেই ধ্যানমগ্ন নেশামধুর অবস্থাতেই একটি মেয়ে ৺নীলাচল ধরকে কিঞ্চিৎ চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, যে-গোপন কাহিনী নীলাচল নিজেকেও কোনও দিন পরিষ্কার ক'রে শুনতে দেয় নি।

খিদিরপুর ডক মজদুরদের মধ্যে কাজ করবার সময় এই মেয়েটিকে দেখেছিল ৺নীলাচল ধর। তার নাম ছিল মাধুরী, বয়স সতের, বাপ

বন্দরের খালাসি, মা বাবুদের বাড়ির ঠিকে ঝি। তার বড় বড় ঘন কালো চোখ দুটিতে জমাট ছিল আশানিরাশাস্বপ্নবিস্ময়ক্ষুধার পাঁচ-মিশেলি রহস্য, যার কোনও খবর সে একটুও রাখত না। মাধুরীর বাড়ন্ত শরীরে ভরপুর যৌবন। তাকে ঢেকে ঢুকে লুকিয়ে চুরিয়ে রাখার শিক্ষা তার হয় নি তাই সে তা ঠিক তেমনি সহজে ব'য়ে বেড়াত একটি বনজ ফুল যেমনি বয়ে বেড়ায় তার প্রগল্‌ভ সৌরভ। ৺নীলাচল ধরের কাজ ছিল ডক মজদুরদের নিয়ে সান্ধ্য ক্লাস করা। অক্ষর পরিচয়, প্রথম পাঠ, ধারাপাত, সহজতম অঙ্ক : এই ছিল পাঠ্য বিষয়, তার সঙ্গে চলত মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ, এবং দেশের সমাজ, রাজনীতি ও পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা। সান্ধ্য ক্লাসে মাধুরীর বাবা সুখনলাল রোজ হাজির হত, প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে আসত মেয়েকে। ৺নীলাচল মাধুরীর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে খুশি হ'য়েছিল; তিন মাসের মধ্যে মাধুরী পুরো বর্ণমালা শিখে নিয়ে প্রথম পাঠ পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছিল। কিছুটা বিস্মিত হ'য়েছিল ৺নীলাচল ধর জানতে পেরে যে মাধুরীকে তার বাবা কোনওদিন স্কুলে পাঠায় নি।

রাজনৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধেও মাধুরীর উৎসাহ প্রথম থেকেই প্রখর। শুধু সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ৺নীলাচল ধর ও অন্যান্য কমরেডদের বক্তব্য শুনত না, মাঝে মাঝে মন্তব্য ও প্রশ্ন ক'রে বক্তাদের থমকে দিত। ৺নীলাচল একদিন শ্রেণী সংগ্রামের মূল তত্ত্বটি প্রাঞ্জল ক'রে বোঝাতে চেষ্টা ক'রে বার বার হোঁচট খাচ্ছিল, মাধুরী হঠাৎ বলে বসল, তার হিন্দী মেশানো বাংলায়, 'বাবুজি, মালিক আর মজদুর যে দু জাতের লোক তা অত কষ্ট ক'রে আমাদের বোঝাতে হয় না।' আর একদিন অন্য এক কমরেড বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করছিল, হঠাৎ মাধুরী বলে উঠল, 'ভাই সা'ব, আমাদের ঘরে বহুৎ ভুখা আছে, খানা বহুৎ দরকার কিন্তু খানা কোথায়? বিপ্লব দরকার তো বুঝলাম, কিন্তু বিপ্লব কোথায়?'

ক্লাসে ব'সে মাধুরী মাঝে মাঝে অপলক চোখে নীলাচলের মুখে তাকিয়ে থাকত, সে দৃষ্টির নির্ভেজাল সরল আবেগ নীলাচল ধরের শরীরে লক্ষ

লক্ষ রোমাঞ্চ তৈরী করত তার সমস্ত নিষেধকে অগ্রাহ্য ক'রে। নীলাচল ধর হঠাৎ দেখতে পেত সম্মোহিত মাধুরীর ওষ্ঠ আর অধর ফাঁক হ'য়ে আছে, দেখা যাচ্ছে তার শুভ্র দাঁতের কয়েকটি, আর লালটুকটুক জিহ্বার অগ্রভাগ। নীলাচল ধর কোনওদিন নারীদেহের·অথবা মনের রহস্যে আকৃষ্ট হয় নি, কিন্তু মাধুরীর সুপুষ্ট স্তন দুটি বার বার তাকে ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্ত ক'রে দিত, আরও এ-জন্যে যে মাধুরী কাঁচুলি পরত না, শাড়ির আঁচল বুক থেকে স'রে গেলে অনেক সময় তার খেয়াল হ'ত না, তার ব্লাউজ স্তন দুটিকে আবৃত করে রাখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত ক'রে দিত প্রচণ্ডভাবে কিন্তু নীলাচল জানত, সর্বদা সে অনুভব করত, মাধুরীর মধ্যে অখণ্ড এক সরলতা, যাকে তার পবিত্র মনে হ'ত, মনে হ'ত ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি জেনুইন, কেননা মাধুরী সর্বহারা শ্রেণীর কন্যা, বাপ তার ডক-মজুর, নিজেও সে সুযোগ পেলে মাল বহন করে। ৺নীলাচল ধরের কাছে মাধুরী অতএব হ'য়ে গিয়েছিল তার সংগ্রামের ও আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতীক।

মাধুরীকে ভালো লেগেছিল ৺নীলাচল ধরের, বিশেষ আগ্রহ নিয়েই সে মাধুরীকে বর্ণমালা পড়াচ্ছিল, যোগ-বিয়োগ শিখিয়ে সরল গুণ-ভাগ শুরু করেছিল, এই সময় 'একটা ঘটনা ঘটে গেল। বন্দরে হরতাল, মজদুররা কাজ করছে না, তাদের মধ্যে সুখনলালও আছে। পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং খিদিরপুরের ডক মজদুরদের হরতালের তীব্র নিন্দা ক'রে বলেছেন, যারা এই হরতালের নেতৃত্ব করছে তারা দেশের শত্রু, তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকেও হীন করবার চেষ্টা করেছে, এখন চাইছে দেশকে দুর্বল ক'রে রাখতে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে বন্দরের কর্তৃপক্ষ হরতালে শামিল মজদুরদের বরখাস্ত ক'রে নতুন মজদুর নিয়োগ করছে, হরতালী মজদুররা পিকেটিং ক'রে নতুন নিযুক্ত মজদুরদের কাজে যেতে দিচ্ছে না। এক উত্তেজিত অবস্থায় একদিন কেউ জানল না কি কারণে বন্দরের মজদুর আর খিদিরপুরের একদল বাসিন্দাদের মধ্যে দাঙ্গা লেগে গেল, পুলিস দশ রাউণ্ড গুলি করল, সুখনলাল মারা পড়ল। পার্টি

তখন বেআইনী ছিল। পার্টি থেকে আদেশ এল, ডক এলাকায় পরিচিত কমরেডদের গা ঢাকা দিতে হবে, যাতে পুলিসের হাতে ধরা পড়তে না হয়। ৺নীলাচল ধর তিন মাস ডক এলাকায় যেতে পারল না। যখন গেল, তখন সুখনলালের স্ত্রী ও মেয়ে দুজনেই নিখোঁজ। হরতাল সফল হয় নি, বেশ কিছু মজদুর বরখাস্ত হবার পর নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে, যারা আছে তারাও সান্ধ্য ক্লাসে আসতে ইচ্ছুক নয়। এদেরই কয়েক-জনকে প্রশ্ন ক'রে ৺নীলাচল ধর জানতে পারল মাধুরীর মা তাকে নিয়ে ছাপড়া জিলায় নিজেদের গ্রামে চলে গেছে।

মনে দাগ-কাটা একটা মানুষ যে এভাবে হঠাৎ হারিয়ে যেতে পারে ৺নীলাচল ধরের এ-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। মাধুরী ঠিক নিখোঁজ হ'য়ে যায় নি, সে আছে, শুধু ৺নীলাচলের নাগালের মধ্যে নেই। ছাপড়া জেলার কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রামে চলে গেছে মাধুরী, সেখানে মার্কস-লেনিনের নামগন্ধ নেই, বন্দর-কারখানা নেই, আছে শুধু প্রাচীন জমিদার-প্রজা আর উঁচুজাত নিচুজাত সম্পর্ক। কি কলকাতায় কি বোম্বাই এ পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও মেয়েকে দেখলে ৺নীলাচলের মনে পড়ে যেতো মাধুরীকে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে মাধুরীর বৈষম্য (যাকে ৺নীলাচল ধর মনে করত বৈশিষ্ট্য) তাকে আঘাত করত। এক রাত্রিতে, শুধু এক রাত্রিতে, ৺নীলাচল একটা স্বপ্নও দেখে ফেলেছিল মাধুরীকে নিয়ে : বন জঙ্গল নদী মাঠ পেরিয়ে ৺নীলাচল চলছে, চলছে, চলছে, আর খুব সামনে, অথচ নাগালের বাইরে, তার আগে আগে চলছে মাধুরী। মাধুরীর ঘনকালো চোখের আহ্বান নিঃশব্দ স্পষ্টতায় বলছে, এসো বাবুজি, চলে এসো আমার গাঁয়ে।

মাধুরী ছিল ৺নীলাচলের লিপ্ততার অন্যতম ফলশ্রুতি। আমি নির্লিপ্ততাকে আলিঙ্গন করার ফলে আমার জীবনে কোনও মাধুরী আসতে পারে নি।

বড়দাদা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'বিবাহে তোমার সম্মতি আছে তো?'

প্রশ্নটা আমাকে সামান্যতম ধাক্কাও দিল না। আমার নিরুত্তর মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে বড়দাদা বললেন, 'আমাদের ইচ্ছে তুমি বিবাহ করো। একটি মেয়ে আমার বেশ পছন্দ। বিনয়কুমার বসুর নাম নিশ্চয় শুনেছ। আমার চেয়ে মাত্র এক বছরের জুনিয়র, প্রেসিডেন্সীতে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। বিনয় এখন ডিফেন্স সেক্রেটারী। তার একমাত্র মেয়ে। এম. এ. পাস করেছে। বিনয়ের মেয়েকে বিবাহ করলে তোমার কর্মজীবনের পক্ষে শুভ হবে।'

আমি তখনও কিছু বলতে পারছি না। বিয়ে-করব-না বলাও লিপ্ততার প্রলোভনে সাড়া দেওয়া। বিয়ে-করব বলাও ইনভলবড হ'য়ে যাওয়া।

বড়দাদা আমার নীরবতাকে সুবাধ্য অনুজের বিনীত সম্মতি ব'লে ধরে নিয়ে বললেন, 'তাহলে তুমি একবার দিল্লী গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এসো। আমি তো দেখে এলাম এই সেদিন। দিল্লী য়ুনিভারসিটির ল' ফ্যাকাল্টিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে তো বিনয়ের কাছেই উঠেছিলাম; আমার বেশ ভালো লেগেছে মেয়েটিকে। বিনয়েরও খুব আগ্রহ। এবার তুমি গিয়ে দেখে এসো।'

আমি এবার বলতে পারলাম, 'তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

বড়দাদার কাছ থেকে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীলাচলের প্রেতাত্মা হিংস্র আক্রোশে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'শালা বাঞ্চোৎ শুয়োরের বাচ্চা!' (ম'রে গিয়ে নীলাচল দারুণ খিস্তিবাদ হ'য়ে গিয়েছিল, জীবিত অবস্থায় একটা 'নোংরা' কথাও তার জিভে আসতো না।) 'তুমি এবার আই-সি-এস'এর মেয়েকে বিয়ে ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে চাকরির সিঁড়ি ভাঙবার মতলব করছ! লজ্জা সরম কিসস্যু অবশিষ্ট নেই তোমার?'

আমি শুধু পাথুরে চোখে জ্বলন্ত প্রেতদৃষ্টিকে বললাম, 'আমার কোনও মাধুরী নেই।'

প্রেতদৃষ্টির সবটুকু আগুন মুহূর্তে নিভে গেল।

অপরাজিতা ধর আমার নির্লিপ্ততাকে ভাঙতে পারে নি। ভাঙতে পারে নি আমাদের দুজনের সঙ্গম-সজাত কন্যা, নিবেদিতা ধর।

স্বামীর কর্তব্যে আমি অবহেলা করি নি। অপরাজিতা ধরকে আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। বদলে চেয়েছি, আমার ইচ্ছে-মত বেঁচে থাকবার অধিকার। দুটোর একটাও হ'তে পারে নি। হাই-সোসাইটির মেয়ে হ'লেও অপরাজিতা ধর স্বাধীনতা চায় নি, চেয়েছে স্বামীর কবলিত জীবনে সীমিত ক্ষেত্রে অমিত দাপট। সম্পূর্ণ পুরুষনির্ভর হ'য়েও পুরুষের ওপর মাতব্বরি করার আর্ট আমাদের বিদগ্ধ সমাজের আধুনিকা শিক্ষিত মেয়েরা সুন্দরভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। অপরাজিতা ধর চেয়েছে আমার ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর ক'রেও আমার জীবনটাকে নিজের পছন্দমত রাস্তায় চালিয়ে নিতে। পারে নি। আমি চেয়েছি অপরাজিতা ধরকে ধরে রেখে নিজের জীবনটাকে নিজের ইচ্ছেমত বাঁচতে। পারি নি। অতএব একটা চিরস্থায়ী টেনশন আমার আর অপরাজিতা ধরের দাম্পত্য সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। অপরাজিতা ধর আমার মধ্যে দেখতে চেয়েছে উচ্চাশা, আরোহণের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রম ও অধ্যবসায়। চেয়েছে, শ্বশুরের প্রভাব প্রতিপত্তি সদ্ব্যবহার ক'রে আমি দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে জাঁকিয়ে বসি, ধাপে ধাপে পদোন্নতির মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের শিখরে উঠে যাই, অথবা ফরেন সার্ভিসে মনোনীত হ'য়ে লণ্ডন-রোম-বন-ওয়াশিংটনে রাজদৌত্য করি। আমি করতে চাইনি, অনেক বছর করি নি, শেষ পর্যন্ত করতে বাধ্য হ'য়েছি, কিন্তু অপরাজিতা ধরের সামাজিক উচ্চাশার উত্তাপে নয়, আমার নির্লিপ্ততারই উচ্চতর ধাপে অবরোহণের জন্যে।

একটা ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের জলমাটিমানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার উপক্রম হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আতঙ্কিত হ'য়ে প্রথম সুযোগে দিল্লী চলে এসেছি।

সে কথা একটু পরে বলছি।

আমাদের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে কথিত আছে ঋষিগণ নির্লিপ্তভাবে

সংসারধর্ম করতেন। পত্নী এমন কি সুন্দরী কুমারী কন্যাকেও তাঁরা ভোগ করতে বিরত হতেন না, ভোজ্যপেয়তে তাঁদের উৎসাহ কম থাকত না, তথাপি তাঁরা নির্লিপ্ত থাকতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মাতা সত্যবতীর আদেশে বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিলেন, তাদের গর্ভে পুত্র-উৎপাদনও ক'রেছিলেন, কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা সম্বন্ধে তাঁর কোনও লিপ্ততা ছিল না। (অপ্সরার ন্যায় রূপবতী যে দাসীর গর্ভে তিনি বিদুরের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধেও ব্যাসদেব ছিলেন সমান নির্লিপ্ত, সে যে রাণী অম্বিকা নয়—যাকে তিনি আগেই একবার গর্ভবতী করেছিলেন—ব্যাসের তাও খেয়াল হয় নি।) আমিও অপরাজিতা ও নিবেদিতা ধর সম্বন্ধে অনুরূপ নির্লিপ্ত থাকতে চেয়েছিলাম। কিছুটা পেরেছি, কিছুটা পারি নি। পারা-না-পারার ফলাফল কতোটা কী হ'য়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার লিপ্ততা আমি এড়িয়ে যেতে পেরেছি।

নির্লিপ্ততার কথা উঠলে আমি অনেক সময় ভাবি স্বাধীন ভারতবর্ষে যা নিয়ে ভদ্রমহোদয়গণ সবচেয়ে বেশি লিপ্ত হ'য়েছেন তা হল ক্ষমতা, বিত্ত আর নারী। সবচেয়ে কম লিপ্ততা পেয়েছে দেশ, সমাজ, মানুষ। অবশ্যি দেশ-সমাজ-মানুষের শতনাম জপে জপেই আমরা সবাই ক্ষমতা, বিত্ত আর নারীতে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। ক্ষমতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, সব আনুগত্য ও সম্মানের চুম্বক। যার ক্ষমতা আছে, রাজকীয় ক্ষমতা, তার কাছেই আমরা নতশির, আনতপ্রাণ, যুক্তহাত। ক্ষমতার কাছে বিত্ত-ও হাতজোড় করে থাকে আমাদের গণতন্ত্রে, বিত্ত তার কলকাঠি নাড়ে আড়াল থেকে, সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে হাজির করবার সৎসাহস বিত্তের নেই। ক্ষমতা ও বিত্ত—পলিটিকাল ও একনমিক পাওয়ার—যমজ ভাই হলেও এ দেশে পলিটিকাল পাওয়ারের মান ও সম্মান অনেক বেশি। যাদের পলিটিকাল পাওয়ার একবার আয়ত্তে এসেছে তারা, অতএব, সে পাওয়ারকে আর ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। তাই পরাজয় অথবা মৃত্যু ছাড়া

আর কোনও দুশমন আমাদের পলিটিশিয়ানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখে এসেছি একবার ক্ষুদ্রতম রাজনৈতিক ক্ষমতা যে কব্জা করতে পেরেছে তখুনি সে বিত্ত সংগ্রহে উঠে পড়ে লেগে গেছে। যে কোন উপায়ে হোক, এবং উপায় এ সব ক্ষেত্রে অসৎ হতে বাধ্য, ধন সম্পত্তি বাড়িয়ে নেবার একটা প্রচণ্ড উলঙ্গ নাটক অহরহ চলছে জাতীয় মঞ্চের নেপথ্যে। ঘটনাগুলি অনেকেই জানে, কিন্তু যেহেতু হাত কারুর সাফ নয়, তাই বাইরে টেনে আনতে তৈরী নয় কেউ। ক্ষমতা এবং ধন টেনে আনছে নারীকে। আমি এমন মন্ত্রী কমই দেখেছি যিনি পরিণত বয়সে হঠাৎ নতুন করে যৌবন-ভোগ করবার প্রলোভন এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে শতাংশে সামান্য হলেও একটা বিরাট সংখ্যার মানুষদের আয়ু বেড়েছে, স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে, উত্তম আহারে ভোগতৃষ্ণা ও ভোগক্ষমতা দুইই বেড়ে গেছে, অতএব বেড়েছে সেক্স, যৌন সম্ভোগ। মন্ত্রিগণ যে নৈতিক মান তৈরী করছেন তাই হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে দেশের শিক্ষিত ও সম্পন্ন অংশের নৈতিক মান। কিংবা হয়ত মন্ত্রীরাই বিত্তবানদের নৈতিক মান গ্রহণ করে তাকে জাতীয় নৈতিক মানের মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন। সব কিছু মিলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে মানুষের ওপর মানুষের জুলুম অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে, ক্ষমতাবানের ক্ষমতা বেড়ে অতিকায় হচ্ছে, দুর্বল হয়ে পড়ছে দুর্বলতর। ১৯৩৬ সালে ঔপন্যাসিক ডি. এইচ. লরেন্স 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হবেন রন্ধনশালার পরিচালক, বাণিজ্য মন্ত্রী হবেন গৃহরক্ষক, পরিবহণ মন্ত্রী হবেন প্রধান কোচোয়ান—সব মন্ত্রীরাই হবেন প্রধান ভৃত্যের চেয়ে বড় কিছু নয়, শুধু ভৃত্য।' পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে মন্ত্রীদের এই অবস্থা কোনওদিন হয়তো হয়ে যাবে, কিন্তু ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে মন্ত্রীরা হবেন প্রবল হতে প্রবলতর প্রভু, এবং একদিন, প্রধানমন্ত্রী হবেন একাধিনায়ক।

অতএব, নির্লিপ্ততা।

'অপরাজিতা ধরের কাছে আমার নির্লিপ্ত নিরুত্তাপ ওকালতনামা : আমি দ্বিতীয় নারীতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইনি।

৺নীলাচল ধর মাধুরী নামে একটি মজদুর কন্যাকে —বেসেছিল। যদিও —বাসাকেই সে বুঝে উঠতে পারেনি, স্বীকার করা তো দূরের কথা। এমন অবশ্যি কখনও হতে পারত না যে ৺নীলাচল ধর কোনও-দিন ৺মাধুরীকে বিবাহ করে বসত। এই প্রাচীন ভারতবর্ষে এ ধরনের দুর্ঘটনা কখনও ঘটে না। এমন একটা ভদ্র শিক্ষিত কমিউনিস্টের নাম করতে পারবে না যে একটি মজদুর বা চাষীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে বসেছে! কৃষক মজদুরদের সঙ্গে ভদ্র শিক্ষিত উঁচুজাত কমরেডদের এখনও আপনি তুমি সম্পর্ক, তুই তুকারির সমতা নেই। বামুন কমরেডদের গাঁয়ের লোকেরা গড় হয়ে পেন্নাম করে, প্রণাম নিতে কারুর আটকায় না। সব-মানুষ-সমান এই অলীক স্লোগানে মানুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যখন আমরা বুঝতে পারি, স্বীকার করে নি, সব মানুষ সমান নয়, সব মানুষ সম্মানীয়।

অপরাজিতা ধর অনেক সময় নালিশ করেছে, আমি তাকে— বাসি না।

আমি শুধু বলেছি, আমার জীবনে অপরাজিতা ধর ছাড়া অন্য রমণী নেই।

অপরাজিতা ধর বলেছে, 'আমিও নেই!'

আমি বলেছি, 'তুমি যা আছ, আছ।'

আমিও যা আছি, থাকতে চেয়েছিলাম। জিলা শাসক। শাসন করব, কিন্তু কেয়ার করব না। যা হবার তা হয়, হচ্ছে, হবে। আমি কিছুর মধ্যে নেই। নিয়ম আছে। কানুন আছে। ক্ষমতা আছে। উঁচু মানুষদের দাপট আছে। লোভ আছে। দুর্বলদের অদৃষ্ট আছে। ঈশ্বরও নাকি আছে।

যা আছি তা থাকতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত থাকা গেল না।

১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। সহজ চোখে

দেখতে গেলে একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি কিন্তু সহজ চোখে ঘটনা দুটিকে দেখতে পেলাম না। আমার কাছে দুটো ঘটনার সঙ্গে কোনও একটা যোগাযোগ আছে মনে হল, যদিও আমি সে যোগাযোগ বুঝে উঠতে পারলাম না।

দুটি ঘটনার ভৌগোলিক দূরত্বও কিন্তু বিপুল। যদিও দুটিই ঘটল ভারতের সীমান্তে। এক সীমান্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে, আরব সাগরের গায়ে, অন্য সীমান্ত উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে, হিমালয় পেরিয়ে। প্রথম ঘটনা একান্তভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহত্তম, প্রবলতম প্রতিবেশীর প্রত্যক্ষ সংযোগ।

উভয় ঘটনাই ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে কাণ্ডান্তকারী।

শরৎ মিত্র আকাশ-ছোঁওয়া অহংকার নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির যে ঐতিহাসিক সাফল্যের বড়াই করেছিল, কেরল রাজ্যে গণ-নির্বাচিত সেই সি-পি-আই সরকার ১৯৫৯ সালে জবাহরলাল নেহেরু অনায়াসে উৎপাটন ক'রে ফেললেন। ফেলবার পরিবেশ তৈরী করবার জন্যে কেরলের লাল সরকারের বিরুদ্ধে একটা "মুক্তি সংগ্রাম" তৈরী হল, আর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন নেহেরু-তনয়া ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী, সে বছরের কংগ্রেস সভাপতি। কেরলের লাল সরকারের দুটো অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে গিয়েছিল। প্রথম, কেরলের নায়ার ও ক্রিশ্চিয়ান শাসিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে লাল সরকার ঢেলে সেজে সেকুলার করতে চেয়েছিল। তার চেয়েও অক্ষমণীয় অপরাধ: ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সত্যিকারের ভূমি-সংস্কারের সূচনা ক'রে বসেছিল কেরলের কমিউনিস্ট শাসকরা। জমিদার জোতদারদের কাছ থেকে জমি আইনের মাধ্যমেই কেড়ে নিয়ে একেবারে দরিদ্র ভূমিহীন চাষীদের জমি দেবার ব্যবস্থা করছিল। এই বিপথগামী শাসকদের শায়েস্তা না-ক'রে উপায় ছিল না জবাহরলাল নেহেরুর। দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁর গভর্নমেণ্ট প্রাচীন সামন্ত-

তান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার "সংস্কার" ক'রে দু কোটি নতুন জমিদার তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন, দু কোটি কুলাক, এবং এরাই ছিল কংগ্রেসী রাজত্বের প্রধান সামাজিক ভিৎ। এদের আতঙ্কিত করা সমাজতান্ত্রিক জবাহরলাল নেহেরুর পক্ষে সম্ভব ছিল না, বঞ্চিত করা তো দূরের কথা।

আমি শরৎ মিত্রকে যা বলেছিলাম, ঠিক তাই হল।

অতি অনায়াসে নেহেরু ও তাঁর কন্যা দেশব্যাপী একটা কমিউনিস্ট-বিরোধী মানসিকতা তৈরী ক'রে ফেললেন।

মিডিয়া তৈরী করল 'পাবলিক'। 'পাবলিক' সমর্থন দিল জাতীয়তাবাদের মোড়লদের।

কেরলের পাবলিকও।

কেন্দ্র দ্বারা উৎপাটিত হ'য়ে কমিউনিস্টরা লেজ গুটিয়ে ভালো ছেলের মত বনবাসে চলে গেল। চেঁচামেচি করল নিশ্চয়, সভা সমিতি, মিছিল, প্রতিবাদ সবই হল। কিন্তু মেদিনী কাঁপল না। মেদিনী কাঁপিয়ে তোলবার মত কমিউনিজম কোথায় ভারতবর্ষে?

সোভিয়েত সরকার নিশ্চয় দুঃখিত হ'লেন। নিজের সন্তানের দুর্দশায় কোন জনকের না দুঃখ হ'য়ে থাকে?

কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। নেহেরু, মস্কোর চোখে, সোস্যালিস্টই রয়ে গেলেন। রয়ে গেলেন প্রগতিবাদী তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম মুখ্য নেতা। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিশ্বব্যাপী সংগ্রামেব অন্যতম বীর যোদ্ধা।

সি-পি-আই নামক ক্ষুদ্র এক অনুগত কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে অনেক বড়, অনেক বেশি মূল্যবান দোস্ত্ জবাহরলাল নেহেরু ও তাঁর সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল তিব্বতে। লামারা চীনের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসল। লামাদের পেছনে দাঁড়াল তিব্বতের খাম্পা-রা, দুর্ধর্ষ লড়াকু জাত, জমির মালিক। খাম্পা আর লামাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন দালাই লামা, তিব্বতী বৌদ্ধদের জীবন্ত ভগবান।

তিব্বত চীনের ভৌগোলিক অংশ অথবা সামরিক শক্তিতে ধরে রাখা উপনিবেশ, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস এ প্রশ্নটিকে অমীমাংসিত রেখে হঠাৎ ১৯৪৭ সালে শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তিব্বতে দালাই লামার বিদ্রোহ প্রশ্নটাকে একটা বিরাট মশালের মত তুলে ধরল হিমালয়ের পায়ে। সে মশালের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল ভারতবাসীর উত্তপ্ত মানসে।

ইংরেজ তিব্বতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটিকে অনিশ্চিত রাখবার বিলাসিতা উপভোগ করতে পেরেছিল। কার্জন ইয়ংহাজবেণ্ড-এর নেতৃত্বে সামরিক মিশন পাঠিয়ে লাহ্‌সায় ইংরেজের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিলেন। তিব্বতকে সরাসরি ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবার পথে অন্তরায় ছিল অনেক। মধ্যএশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য ক্ষুধাকে আটকে রাখবার জন্যে ইংরেজের প্রয়োজন ছিল চীনের সঙ্গে সদ্ভাব, প্রয়োজন ছিল চীনের সম্পদ লুঠে নেবার জন্যেও। অতএব ইংরেজ তিব্বতের ওপর চীনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল, শুধু কর্তৃত্বকে আইনগত সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ তিব্বতে দালাই লামার প্রশাসনকেও মেনে নিয়েছিল, শুধু এড়িয়ে গিয়েছিল যে প্রশ্নটা তা হল : তিব্বতের সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য কি তিব্বতীদের হাতেই অর্থাৎ দালাই লামার হাতে, না কি তা চীনের হাতে।

এ প্রশ্ন এড়াতে পারে নি ভারতবর্ষ ১৯৫০-৫১ সালেই, যখন চীনের কমিউনিস্টরা গোটা চীনে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতকে মুক্ত করবার সংকল্প ঘোষণা ক'রে বসল এবং সে উদ্দেশ্যে বিরাট এক সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম ক'রে তিব্বতে প্রবেশ করল।

দেখা গেছে, জমি আর ভূমি নিয়ে কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়াদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। চীনের বুর্জোয়া দল কুওমিনটাং সে-সব এলাকা চীনের অন্তর্ভুক্ত ব'লে দাবি ক'রে আসছে চীনের কমিউনিস্ট শাসকগণ তার এক ইঞ্চিও ছেড়ে দিতে রাজী হয় নি, বরং রাশিয়ার জারেরা মাঞ্চুরিয়ার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল চীন-সাম্রাজ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিয়েছিল,

তাও দাবি ক'রে বসেছে। স্তালিন সোভিয়েত য়ুনিয়নের ভৌগোলিক সীমানা জারদের সময়কার রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সীমানার চেয়ে আয়তনে মৃত্যুর আগে বরং কিছুটা বড়ই ক'রে তুলতে পেরেছিলেন।

চীনের কমিউনিস্টরা তিব্বতকে মুক্ত করার সংকল্প ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের ভদ্র শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণীর কণ্ঠে দাবি সোচ্চার হ'য়ে উঠল : তিব্বত চীনের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। তিব্বতের ওপর ভারতের প্রভাব বজায় রাখতে হবে। এবং তিব্বতকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

ভারতের প্রভাব মানে, ভারত-কেন্দ্রিক ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রভাব।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু বরাবর তিব্বতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রভাবের বিস্তারকে নিন্দা ক'রে এসেছিল। ইয়ংহাজবেণ্ড মিশন তিব্বতে পাঠাবার জন্যে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিল লর্ড কার্জনকে।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু শক্তি ও সাধ্য থাকলে লর্ড কার্জনের নীতিই অনুসরণ করতেন। কিন্তু নতুন-স্বাধীন ভারতবর্ষের তো বৃটিশ সাম্রাজ্যের তুল্য ক্ষমতা ছিল না! তা ছাড়া তখন কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সবে মাত্র বিরতি ঘটেছে, যুদ্ধ আবার কখন শুরু হ'য়ে যায় সে চিন্তাই নেহেরুকে সর্বদা ভাবিয়ে রাখছে। একই সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভূমি ও জমির জন্যে লড়াই করার মত সামরিক রসদ অথবা রাজনৈতিক শক্তি কোনটাই ভারতবর্ষের ছিল না।

আরও একটা বড় সমস্যা ছিল। ১৯৫০ সালে সোভিয়েত য়ুনিয়ন ও চীনের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'য়ে গিয়েছিল। তিব্বতের চীনের সার্বভৌমত্বের দাবির পেছনে মস্কোর পুরো সমর্থন ছিল। তিব্বত নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘাত বাধলে ভারতকে সোভিয়েত য়ুনিয়নেরও বৈরিতা অর্জন করতে হ'ত। স্তালিন তখনও নেহেরুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল অথবা তারও চেয়ে কুৎসিত কিছু মনে করতেন, নেহেরুর বুঝতে বাকী ছিল না যে রাশিয়া ও চীন এই

দুই কমিউনিস্ট শক্তিকে একসঙ্গে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ভারত রাষ্ট্রতরীকে তিনি ভাসিয়ে রাখতে পারবেন না।

অতএব, প্রথম দিকে কিছুটা বিরুদ্ধাচরণ ক'রেও, শেষ পর্যন্ত নেহেরু তিব্বতে চীনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন, এবং দালাই লামাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পিকিং গিয়ে চীন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিব্বত নিয়ে একটা চুক্তি সই করতে মদৎও দিয়েছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট নেতারা ভীষণ বাস্তববাদী। তাঁরা একই সঙ্গে দু'টি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেহেরুকে খুশি ক'রেছিলেন। প্রথম সিদ্ধান্তে, তারা তিব্বতে সামাজিক রূপান্তরের গতিকে শম্বুক রাখার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে, বন্ধু-প্রতিবেশী-দেশ ভারতবর্ষকে তিব্বত-ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার যোগ্যতা অর্জন ক'রেছিলেন। তিব্বত নিয়ে চীন-ভারত সমঝোতার উৎফুল্ল সন্তান জন্মাতে সময় লাগে নি। ১৯৫৪ সালে ভারত-চীন একত্রিত হ'য়ে "পঞ্চশীলে"র জন্ম দিয়েছিল।

পাঁচ বছরও বেঁচে থাকতে পারে নি ভারত-চীন মৈত্রী। এবং তার সন্তান, পঞ্চশীল।

উভয়েরই মৃত্যু হল তিব্বতে। ১৯৫৯ সালে ঘোরতর ব্যাধি। ১৯৬২ সালে মৃত্যু।

তিব্বতে সামাজিক রূপান্তর ত্বরান্বিত ক'রে তোলবার সংকল্প ক'রে বসল চীনের কমিউনিস্ট নেতারা। অতএব, খাম্পা-লামা-দালাই লামা বিদ্রোহ। বহু ধনরত্ন নিয়ে দালাই লামার ভারতে পলায়ন। হাজার হাজার খাম্পা ও লামাদেরও ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ। ভারত কর্তৃক খাম্পা বিদ্রোহীদের সীমিত পরিমাণ সামরিক সাহায্য প্রেরণ। তিব্বত-ভারত সীমান্তে প্রহরীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ। চীন কর্তৃক গোপনভাবে ভারত-ভূমি বেদখলের অভিযোগ। আকসাই-চিন নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বাদানুবাদ। এক কথায়, তিব্বত নিয়ে চীন-ভারত সম্পর্ক বিষাক্ত হ'য়ে ওঠা এবং সীমান্ত বিরোধের মাধ্যমে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি।

এরই মধ্যে, ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ঘটল আর এক মহা বিস্ফোরক ঘটনা। ভারত ও চীনের মধ্যে প্রথম রক্তাক্ত সীমান্ত সংঘাতের পরে সোভিয়েত সরকার এক বিশেষ বিবৃতিতে তাঁদের "বন্ধু" ভারতবর্ষ ও "ভাই" চীনের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষে খেদ প্রকাশ ক'রে বসলেন। এই বিবৃতির যুগান্তকারী তাৎপর্য পৃথিবীর মানুষদের বুঝতে বেগ পেতে হল না। কমিউনিস্ট চীন ও অ-কমিউনিস্ট ভারতের মধ্যে বড় রকমের এক বিবাদে সোভিয়েত সরকার কমিউনিস্ট চীনের পক্ষ নিতে অস্বীকার ক'রে দিলেন। মস্কো-পিকিংএর মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত যে আসন্ন তা পৃথিবীর সবাইকে জানিয়ে দিলেন ক্রুশ্চেভ।

ভারত-চীন-সোভিয়েত রাশিয়ার এই টানাপোড়েনে যার গলায় হঠাৎ শক্ত ফাঁস পড়ল তার নাম সি-পি-আই।

ভারত ও চীনের মধ্যে যদি জাতীয়তাবাদী সামরিক সংঘাত ঘটে, ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা সমর্থন করবে কাকে?

প্রলেটারিয়ান ইনটারন্যাশনালিজম অনুসারে, চীনকে। ন্যাশনালিজমের নিয়মে, ভারত সরকারকে।

"আক্রমণকারী" চীনকে সমর্থন ক'রে জাতীয়তাবাদ থেকে পুনরায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ার দুঃসাহস কি আর আছে সি-পি-আই'র নেতা ও কর্মীদের? সাত বছরের পার্লামেণ্টারী রাজনীতি কি তাদের বিপ্লবী মেরুদণ্ডকে নুইয়ে দেয় নি?

কিন্তু বিষয়টা তো আর কেবল চীন ও ভারত নিয়ে নয়। এ বিবাদের অন্যতম প্রধান শরিক সোভিয়েত য়ুনিয়ন।

সোভিয়েত এ বিবাদে ভারতের পক্ষে। চীনের বিরুদ্ধে।

সি-পি-আই'এর কাছে সবার উপরে মস্কো সত্য, তাহার উপরে নাই।

তাহলে?

তাহলে আর সন্দেহ কোথায়? পথ পরিষ্কার। মস্কো নির্দেশিত পথ।

মস্কোর কাছে কেরলে কমিউনিস্ট শাসনের চেয়ে জবাহরলাল নেহেরুর বন্ধুত্ব বড়।

মস্কোর কাছে চীনের মাও সে-তুংএর চেয়ে জবাহরলাল নেহেরুর বন্ধুত্ব বেশি মূল্যবান।

অতএব সি-পি-আই'র কাছে নেহেরু প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রাধান্য।

কিন্তু এর মধ্যে আমার স্থান কোথায়? মধ্যপ্রদেশ দিল্লী থেকে অনেক দূরে। সি-পি-আই'র অস্তিত্বই প্রায় নেই মধ্যপ্রদেশে। ভারত চীন সংঘাতের উত্তাপ মধ্যপ্রদেশে সামান্যই। আমি বেশ ছিলাম জবলপুরের জিলা শাসক হ'য়ে।

থাকা গেল না। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে কয়েকজন সুদক্ষ অফিসর চেয়ে পাঠালেন। বিশেষ ক'রে যাদের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞান আছে। আমাকে কিছু না জানিয়েই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমার নাম পাঠিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আমি হঠাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীতে বদলি হ'য়ে গেলাম। দিল্লী পৌঁছে দেখলাম খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে আমাকে ডিরেকটারের পদে বসানো হয়েছে। আমার কাজ সি-পি-আই'এর ওপর নজর রাখা, সি-পি-আই সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এক্‌স্‌পার্ট অ্যাডভাইস দেওয়া।

অপরাজিতা ধর, বলা বাহুল্য দারুণ খুশি অবশেষে দিল্লী আসতে পেয়ে। খুশি আমার শ্বশুর ক্যাবিনেট সেক্রেটারী বিনয়কুমার বসু আই-সি-এস মহোদয়ও। আমাকে যে সমস্যায় পড়তে হল তার সঙ্গে পিতা অথবা কন্যা কারুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আমি দিল্লী বদলি হলাম ১৯৬১ সালে। কিছুদিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোপনে প্রশ্ন তুললেন সি-পি-আইকে বে-আইনী ঘোষণা করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে কিনা। চীনের সঙ্গে আসন্ন সংঘাতে কমিউ-নিস্টরা কী ভূমিকা নেবে? মুখে তারা যাই বলুক না কেন, ভেতরে ভেতরে কি তারা চীনকে মদৎ দেবে না? তারা কি জাতীয় প্রতিরক্ষা

প্রচেষ্টাকে সাবোতাজ করবে না? সময় থাকতে সতর্ক হ'য়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ক'রে দিয়ে নেতাদের জেলে আটকে রাখাই কি জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে নি?

দু'সপ্তাহ বিচার বিবেচনা করে আমি এ প্রশ্নগুলির জবাবে যে গোপনীয় নোট মন্ত্রীর কাছে পেশ করলাম তা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি উঁচুস্তরের বৈঠকে আমার ডাক পড়ল।

দেখতে পেলাম উপস্থিত অফিসরদের অধিকাংশই সি-পি-আইকে বে-আইনী ক'রে দেবার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, কমিউনিস্টদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে নিতান্ত বিপজ্জনক।

বিরুদ্ধ মত দাখিল করবার জন্য আমাকেই অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হল।

আমি বললাম, 'সি-পি-আই এখন তার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সংকটের মধ্যে আটকা পড়েছে। সি-পি-আই'র পথ বেছে দিচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া। ক্রুশ্চেভ চীনকে সমর্থন করছেন না। সমর্থন করছেন ভারতকে। এ অবস্থায় সি-পি-আই'র নেতারা ভারত সরকারের সঙ্গে থাকতে বাধ্য। তাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। তারা চীন নেতৃত্বের সপক্ষে যেতে পারবে না। অতএব তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার সঙ্গে হাত মেলাতেই হবে। এখন যদি আমরা সি-পি-আই-কে বে-আইনী ক'রে দিই তাহলে তিনটি মূল্যবান জিনিস আমরা হারাব।'

'সেগুলি কি?'

'প্রথম মূল্যবান জিনিস হল, কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে সংঘাতে, যুদ্ধে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের সমর্থন ও সহায়তা। এর রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনেক। সি-পি-আই যদি চীনকে আক্রমণকারী ব'লে, আমাদের অনেক সুবিধে হয়।

'দ্বিতীয় মূল্যবান জিনিস হল সোভিয়েত ও চীনের মধ্যে ঘনায়মান

বিবাদকে বাঁচিয়ে রাখা, পুষ্ট করা। সি-পি-আইকে বেআইনী ক'রে তার নেতাদের জেলে পুরলে মস্কোর পক্ষে ভারতকে পুরো সমর্থন দেওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন হ'তে পারে।

'তৃতীয় মূল্যবান জিনিস হল, সি-পি-আই নেতৃত্বকে জাতীয়তাবাদী ক'রে তোলা। আজ যদি সি-পি-আই-কে বেআইনী ক'রে নেতাদের ধরপাকড় করা হয়, এই দলকে আমরা বিনা প্রয়োজনে তার সবচেয়ে বড় সংকট থেকে দূরে রেখে দেব। যদি চীনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বাধে এবং যদি সি-পি-আই নেতারা জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় শামিল হন, এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের চরিত্রটাই ভীষণ বদলে যাবে।'

কয়েকজন অফিসর আমার বক্তব্যকে নানা দিক থেকে আক্রমণ করলেন। তাদের প্রধান আক্রমণ এল আমার সোভিয়েত-চীন বিভেদকে 'বড় করে দেখবার' বিরুদ্ধে। তাঁরা বিশ্বাস করতে পারলেন না, এ বিভেদ একটা বড় রকমের 'ধোঁকা' নয়। শেষ পর্যন্ত মস্কো পিকিংএর সঙ্গেই হাত মেলাবে, তাঁরা বললেন, এবং তখন আমরা একেবারে ফেঁসে যাবো।

সরকারের উচ্চতম মহলে কিন্তু আমার অনুশীলনই গৃহীত হল। আমি হঠাৎ কেন্দ্র সরকারের 'কমিউনিস্ট বিশেষজ্ঞ' হ'য়ে গেলাম।

কিন্তু, হায়, আমার বহুকালের পরিশীলিত নির্লিপ্ততার দেওয়ালে ফাটল দেখা দিল।

আমার বুকের কোন অন্তস্তলে গোপন ব্যথা আমাকে খোঁচা দিতে লাগল।

আমার মনে পড়ল একদিন কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পর্যন্ত সমর্থন ক'রে নি বৃহত্তর নীতি ও স্বার্থের প্রতি আনু-গত্যের জন্যে। ভুল করেছিল, কিন্তু তখন এদের জনগণের কাছ অপ্রিয় কাজ করবার সাহস ছিল। (আমার একবারও মনে হল না আমিও সেদিন এদের একজন ছিলাম, তবু একটা অব্যক্ত ব্যথা আমাকে খুঁচতে লাগল। ১৯৪৭ সালে মধ্য কলকাতায় একটি কলেজী যুবক এক সন্ধ্যায়

একদল দেশপ্রেমিক যুবকদের হাতে প্রহৃত হ'য়েছিল। তারা যুবকটিকে 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল' আখ্যা দিয়ে পিটিয়েছিল। যুবকটির নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, জামা-পায়জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে একটুও ভয় পায় নি, তার মেরুদণ্ড একটুও নুয়ে পড়ে নি। যুবকটির নাম ছিল নীলাচল ধর, ২৬ বছর বয়সে সে মরে গিয়েছিল।)

আমি দেখতে পেলাম, আমি আরও একবার দেখতে পেলাম, আমাদের দেশের ভদ্র উচ্চশিক্ষিত মানুষদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা খুব সীমিত। আমরা আসলে অত্যন্ত ইনসিকিওর। কোনও একটা শক্ত খুঁটি আঁকড়ে না ধরলে আমাদের চলে না। এবং যেহেতু আমাদের নিজেদের কোনও শক্ত খুঁটি নেই, এক ঠিকানাহীন ঈশ্বর ও অদৃষ্ট ছাড়া, তাই আমরা বাইরের শক্ত খুঁটি না ধরতে পারলে দুর্বল হ'য়ে যাই। এ কারণেই পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেসের নেতারা ইংরেজের গণতন্ত্রকেও আঁকড়ে আছেন; নতুন এলিটরা ধ'রে আছি মার্কিন আদর্শকে, আর কমিউনিস্টরা মস্কোকে। আমরা কোন পথে চলব তার নির্দেশ আসবে বাইরে থেকে। কৃষিপ্রধান নিরক্ষর দরিদ্র দেশেও আমরা বৃটেনের স্থপতি অনুসারে 'গণতন্ত্র' গড়ব। স্যাম চাচার অফুরন্ত উপচে-পড়া ভাণ্ডার থেকে যত চাই দান-ঋণ নেব, নিজেদের ভূমি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ক'রে খাদ্য সমস্যা সমাধান করব না। বিপ্লব করতে চাইব, বিপ্লবের ভাষা রপ্ত করব, কিন্তু কোন পথে বিপ্লব আসবে তার নির্দেশ ক'রে দেবে বাইরের গুরুরা। স্বাধীন, স্বনির্ভর মানসিকতা এখনও উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ভারতবাসীর নাগালের বাইরে।

ছাব্বিশ বছরে ম'রে যাওয়া নীলাচল ধরের প্রেতাত্মা এখন আমাকে আর জুলুম করে না।

সেই প্রাচীন শব আমাকে আর বয়ে বেড়াতে হয় না।

মৃত নীলাচলের প্রেত বুঝি এতদিনে মুক্তি পেয়ে গেল। গয়া-গঙ্গায় কেউ কি পিণ্ড দিয়ে এল?

অপরাজিতা ধর এখন রাজধানীর বিখ্যাত মহিলাদের একজন।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময় জওয়ানদের জন্যে অপরাজিতা ধর দশ হাজার কম্বল সংগ্রহ ক'রে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় সেবার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। এখন সে সিটিজেন্স্ কমিটি ফর দি ভ্যাকেশন অব চাইনীজ অ্যাগ্রেশানের সহসভাপতি।

আমি স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকে জয়েন্ট সেক্রেটারী। কমিউনিস্ট রাজনীতিতে এক নম্বর 'বিশেষজ্ঞ'।

১৯৬৪ সালে আবার কয়েকটি ঘটনা ঘটল, পরস্পর সম্পর্কবিহীন ঘটনা। জবাহরলাল নেহেরু স্বর্গে গেলেন। নিকিতা ক্রুশ্চভ গেলেন বনবাসে। সি-পি-আই ভেঙে দু'টুকরো হল। অপরাজিতা ধর পদ্মশ্রী হল। নীলাচল ধর আই-এ-এস হৃদরোগে আক্রান্ত হল। মরল না।

প্রেতের মুক্তির খবর পেলাম আমি ১৯৬২ সালে এক পরম উত্তেজিত দিবসের শেষে, এক ক্লান্ত রজনীতে।

সি-পি-আই আক্রমণকারী, আগ্রাসী চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রস্তুতি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। সীমান্ত-বিরোধের জন্যে পুরো দোষ চাপিয়েছে চীনের ওপর। নেহেরু সরকারকে নির্ভেজাল সমর্থন জানিয়ে ভারত-ভূমি থেকে চীনা সৈন্যের ত্বড়িৎ অপসরণ দাবি করেছে।

সি-পি-আই'র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা বিশ্লেষণ করার কাজ পড়ল আমার ওপর। দশ পৃষ্ঠা একটি নোটের শেষ দুই প্যারাগ্রাফে যা লিখলাম, তার মর্মকথা হল : সি-পি-আই এবার ভাঙবে। চীন-সোভিয়েত বিরোধের চাপে নয়। এই বিরোধ দলের আভ্যন্তরীণ কলহকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে, আরও বিষাক্ত ক'রে দেবে। সি-পি-আই ভেঙে সম্ভবত তিন-টুকরো হবে। এক টুকরো থাকবে কংগ্রেসের সঙ্গে, তাকে নিয়ে সরকারের দুশ্চিন্তা নেই। একটুকরো হবে চীন পন্থী। এরা ভারতবর্ষে বর্তমানে কিছু ক'রে উঠতে পারবে না। তৃতীয় টুকরোর ওপরেই সরকারকে কড়া নজর রাখতে হবে। সি-পি-আই'এর এই অংশ মস্কো ও চীনের কবল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে

মুক্ত করতে চাইবে। এ নোট যেদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সকাশে পাঠিয়ে দিলাম, সেদিন রাত্রে ৺নীলাচলের প্রেত আর আমাকে উৎপাত করল না।

॥ সাত ॥

মস্কভা নদীর উঁচু তীরভূমির মাথার ওপরে বিশালমুকুট ক্রেমলিন। ১১৪৭ সালে ক্রেমলিন প্রাসাদগুচ্ছের শুরু, প্রায় ৪০০ বছর ধরে এর নির্মাণ। টারটার ভষায় ক্রেমলিন মানে দুর্গ। এখন ৬৪ একরব্যাপী এই মহান প্রাসাদাবলীতে প্রাচীন রাশিয়ার অবিশ্বাস্য ঐতিহ্য ও সোভিয়েত য়ুনিয়নের আকাশ-চুম্বী শক্তি একত্র সমন্বিত। যে সুন্দরী মেয়েটি আমার গাইড, সে বলল, ক্রেমলিনের বৈভব দেখতে চান তো সোফিস্কায়া উপকূলে নদীর ওপারে রাত্রিতে চলুন, যেখানে বৃটিশ দূতাবাস রয়েছে, সেখান থেকে আমরা দেখব। দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। একের পর এক গির্জার আলোকিত মিনার আকাশ ভেদ ক'রে উঠে গেছে, ঈশ্বরের দিকে ; ক্রেমলিনের প্রধান প্রাঙ্গণের মাঝখানে ১৬শ শতাব্দীতে নির্মিত আইভান দি গ্রেটের বেল টাওয়ার মস্কোর আকাশকে সম্রাটের মত যেন শাসন করছে। এই সেই গ্রানোভিটায়া পালাটা (বহুরূপী হল) যেখানে জারদের সিংহাসন এখনও সুরক্ষিত ; আর তার পরেই এই সেই বলশয় ক্রেমলিয়ভ্স্কি (গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্যালেস), সোভিয়েত সরকারের দপ্তর। বহু দূর থেকে এই প্রাসাদের বিশাল সবুজ গম্বুজ এবং লাল পতাকা আমার চোখে পড়েছিল। এই প্রাসাদে সুপ্রিম সোভিয়েটের অধিবেশন বসে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনও। এই প্রাসাদেই বাস করতেন লেনিন (এবং স্তালিন, যদিও আমি এখন স্তালিনের নামও উচ্চারণ করি না।) আমার সুন্দরী গাইড বলছে, ছুটির দিনে ছেলে-

মেয়েদের জন্যে বিরাট নাচের ব্যবস্থা হয় ক্রেমলিন প্রাসাদে ; ৫০,০০০ ছেলেমেয়েকে এক একটি উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই যে এত গাছ দেখছেন, সব গাছগুলিকে আলোর মালা পরিয়ে দেওয়া হয় নাচের উৎসবের সময়। বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে সে আবার বলছে, সোভিয়েত দেশ তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীর দেশ। এ দেশে শিশু থেকে যুবক-যুবতীদের সর্বাত্মক গঠনের জন্যে যা করা হয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তা আপনি দেখতে পাবেন না। এবং আরও একবার লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বলছে, ইণ্ডিয়ার তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীদের প্রতি সোভিয়েত দেশ গভীর সহানুভূতি পোষণ করে।

মস্কো লেনিনগ্রাদে শরৎ ঋতু ভারতবর্ষের শরৎ আকাশে মেঘের মতো ক্ষণস্থায়ী। তার আয়ু বড় জোর দু সপ্তাহ। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে শুরু হয় শীত, চলে দীর্ঘ ছ'মাস। থিয়েটার, কনসার্ট, অপেরা ও ব্যালে সব উৎসবমুখর করে রাখে শীতকে। রাশিয়ার শীত নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেছিল ; শীত আর সোভিয়েত শক্তি একত্র হয়ে পরাস্ত করেছিল হিটলারকে। এ দারুণ শীত সোভিয়েত দেশের মানুষেরা কী অনায়াসে উপভোগ করে দেখলে অবাক হতে হয়। প্রতিটি অট্টালিকা ও বাড়িতে সেনট্রাল হিটিং, মানুষদের দেহমন গরম রাখে ভদকা। শীতের প্রথমে নভেম্বর মাসে ক্রেমলিন প্যালেসে এক আলোঝলমল রংদার আনন্দমুখর উৎসবে সম্মানিত হলেন তৃতীয় বিশ্বের পাঁচ জন ঔপন্যাসিক, কবি ও চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী। ১৯১৯ সাল। তার মধ্যে একজন ভারতবর্ষের প্রগতিশীল কবি, শরৎ মিত্র। অর্থাৎ আমি।

যে বিশাল চেম্বারে সুপ্রিম সোভিয়েত বসে তার একটি আসনও শূন্য ছিল না। সোভিয়েত দেশের হাজায় হাজার লেখক, শিল্পী, নট-নটী, নর্তক-নর্তকী, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির পণ্ডিতরা ও সাংস্কৃতিক নেতারা এক মহাসমারোহে উপস্থিত। এঁদের মধ্যে আছেন মিখাইল সলোকভ, যাঁর 'কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' পড়ে ছাত্রকালে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। আছেন ইয়েভটুশেংকো এবং ভজনেসেনস্কি।

আছেন ঔপন্যাসিক ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ, লিওনিড লেওনভ; সঙ্গীত বিশারদ সার্জ প্রকোফিয়েভ ও সোভিয়েত আরমেনিয়ার আরাম খাচাটুরিয়ান; আছেন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বৈজ্ঞানিক নিকোলাই সেমেনভ, মহাব্যোম বিশেষজ্ঞ লিওনিড সেডভ, পরমাণু বৈজ্ঞানিক কাপিটসা, গণিতজ্ঞ আইভান ভিনগ্রাডভ। এত সব মহারথীদের সামনে ফুলে-আলোকে উদ্ভাসিত উচ্চাসনে বসতে আমার সংকোচ হচ্ছিল বই কি। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে এক কালাতীত অনুভূতি আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল; অর্ধ-শতাব্দী ধরে পৃথিবীর প্রগতিশীল পরিবর্তনের নাবিক সোভিয়েত দেশ, আজ আমি তারই আমন্ত্রণে সম্মানিত অতিথি। যে সম্মান আজ আমার ওপরে বর্ষিত হচ্ছে তার অধিকারী আমি শরৎ মিত্র নই, আমাদের দেশের অগণিত দরিদ্র দুর্বল মানুষ, আমি যাদের কবি।

সমারোহের পৌরোহিত্য করলেন সোভিয়েতের রাষ্ট্রপ্রধান পডগরনি। তাঁর হাত থেকে সম্মানপত্র ও স্বর্ণপদক গ্রহণ করলেন মিশরের ঔপন্যাসিক গালাল অল-রশিদ, আলজেরিয়ার কবি মহম্মদ রফিক, কুবার সমাজতাত্ত্বিক রুডলফ আলফানজো, ইন্দোনেশিয়ার নির্বাসিত কবি আহ্‌মেদ সুবান্দ্রিও, এবং ভারতের কবি শরৎ মিত্র। আমাকে স্বর্ণপদক ও সম্মানপত্র দেবার সময় সংক্ষিপ্ত ভাষণে পডগরনি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর কথা উল্লেখ করে বললেন, 'মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও ইন্দ্রিরা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল ভারত বিশ্ব শান্তি ও মানবিক অগ্রগতির একটি বলিষ্ঠ স্তম্ভ।' সমবেত সুধীগণের করতালিতে অত বড় হলটা কেঁপে উঠল। আমি শুনতে পেলাম আমারই একটি কবিতার রাশিয়ান অনুবাদ লুকানো ইলেকট্রনিকে মৃদু স্বরে আবৃত্তি করা।

ফুল ফুটছে, ফুল ফুটছে
ভাই রে!
হাটে মাঠে কারখানায় বন্দরে।
ফুল ফুটছে ভিয়েৎনামে

আলজেরিয়ার গ্রামে গ্রামে
ভাই রে!
কুবায়, মালয়ে, মিশরে।
কোটি মানুষের মিছিল চলেছে
ভাই রে!
লাল সকালের ডাক এসেছে
তাই রে।
ঘুমভাঙা মানুষের ঢেউ
আগে চলে সি-পি-এস্-ইউ।

এই কবিতাটি আমি ১৯৬৫ সালে কায়রোতে ব'সে লিখেছিলাম। তার অনেক, অনেক আগে, বয়স কম ছিল, আমি একটি কবিতায় স্তালিনের জয়গান করেছিলাম। ১৯৬৫ সালের পর সে কবিতাটি আমি আর ছাপতে দিইনি। ১৯৫৮ সালে আমি একটি কবিতায় লিখেছিলাম ক্রুশ্চেভ যা বলে দিয়েছেন তার ওপর আর কোনও কথা উঠতে পারে না। ঠিক তা নয়, ঐ ধরনের একটা লাইন, না-কি দুটো, এখন আমি ভুলে গেছি। ১৯৬৫ সালেই ঐ কবিতাটি আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এবং লিখেছিলাম এই কবিতাটি যা ক্রেমলিন প্যালেসের মহাসমারোহে লুকানো ইলেকট্রনিকস্-এ প্রসারিত হল।

বিদেশে সম্মান পেলে আমাদের দেশের লেখকরা দেশেও সম্মান পেয়ে থাকেন। ১৯৫৮ সালে কলকাতার পার্ক ময়দানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে শরৎ মিত্রকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হল। একদল বিপথগামী ছোকরা সামান্য গোলমাল সৃষ্টি করেছিল। আমি নাকি আর বিপ্লবী কবি নই! আমার সংবর্ধনায় তেরঙ্গা পতাকা দেখে তারা পরিহাস করেছিল, লাল পতাকা তাদের চোখে পড়ে নি। তখন কলকাতার অবস্থা ঘোর অন্ধকার। 'মার্কসবাদী' কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেছে। আমরা বিকল্প প্রগতিশীল সরকার গঠন করতে চেষ্টা করছি। চীনপন্থী নকশালরা 'মার্কসবাদী' কমিউনিস্টদের

খুন করছে, নিজেরাও খুন হচ্ছে। আমি কিছুদিন কবিতা লেখা বন্ধ রেখেছি। প্রবন্ধ লিখছি বিভিন্ন সংবাদপত্রে গ্রাম বাংলা নিয়ে। কিছু কিছু বাছাই বিজ্ঞাপনের কপি লিখছি দেশে থাকার মাসগুলিতে। আমার প্রধান কর্মস্থান এখন কায়রো আর ক্যুবা।

দিনটা আমার ঠিক মনে নেই। ১৯৭০ সালের শীতকাল। দিল্লীর অশোকা হোটেলে নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সঙ্ঘের বাৎসরিক সভা। আমি বিশেষ আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিয়েছি। আলোচনা চলছে একটি বিতর্কিত প্রস্তাব নিয়ে। আমার মাথা ধরেছে। তৃষ্ণা পাচ্ছে। একটু পানীয় না হ'লে চলছে না। আমি সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বারের সন্ধানে এগোচ্ছি।

পথে বড় একটা বই-ম্যাগাজিনের বিপণি। হঠাৎ চোখ পড়ল একটি প্রৌঢ়ের ওপর। মুখখানা চেনা চেনা। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে, প্রায় সাদা। লোকটি একমনে একখানা ম্যাগাজিনের ওপর ঝুঁকে আছে।

আমি থেমেছি। চেনা প্রায়-চেনা লোক দেখলেই এখন আমার থামতে ইচ্ছে করে। তাদের প্রশংস দৃষ্টি আমার ভাল লাগে। ভালো লাগে তৃপ্তিদায়ক কথা শুনতে। পথ চলতে অনেক প্রশংস দৃষ্টি আমার ওপরে বর্ষিত হয়। আমার ভালো লাগে। কেউ একজন অন্য একজনকে ফিসফিস ক'রে বলে, ঐ দেখ, উনি হচ্ছেন শরৎ মিত্র। বিখ্যাত কবি। আমি না-শোনার ভান করি, কিন্তু শুনতে পাই। আমার ভালো লাগে।

এই লোকটিকে আমি চিনি। সময় এর কাছ থেকে মাশুল আদায় ক'রে নিয়েছে। মুখখানা ভেঙেচুরে পুনর্গঠিত হ'তে গিয়েও হ'তে পারে নি। ভগ্নস্তূপ হ'য়ে রয়েছে। কপালে কেটে বসা গভীর রেখা। নাকের দু পাশে দুটি গভীর ভাঁজ। গলার চামড়া ঝুলুঝুলু।

তবু একে আমি চিনি।

এর নাম নীলাচল ধর। আই-এ-এস। এককালে আমার খুব চেনাজানা ছিল নীলাচল ধর। বন্ধুও বলা যেতে পারে।

আমি নীলাচল ধরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে নীলাচল ধর।

একটু বিরক্ত হয়েই নীলাচল ধর ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে আমার পানে তাকিয়েছে। আমি অপেক্ষা করে আছি তার চোখে প্রশংস দীপ্তি ফোটবার জন্যে।

আমাকে দেখতে পেয়েই চিনতে পেরেছে নীলাচল ধর। আর তক্ষুনি তার চোখ দুটি সবুজ পাথর হ'য়ে গেছে। মরা সবুজ। কোনও স্পন্দন নেই। শুধু মরা সবুজ পাথর।

আমাকেও পাথর ক'রে দিয়েছে ঐ পাথুরে চোখ। আমি কিছু বলতে চাইছি। আমার মুখ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না।

নীলাচল ধর হঠাৎ সরে গিয়ে ডাস্টবিনে 'থুঃ' ক'রে থুথু ফেলছে। তারপর হনহন ক'রে সোজা দরজার দিকে হেঁটে গেছে।

॥ আট ॥

যদি কেউ প্রশ্ন করে, তুমি কোন বইখানা পড়ে সবচেয়ে বেশি সম্মোহিত হয়ে যাও, আমি জবাব দেব, 'অয়ডিপাস রেক্স।'

যদি প্রশ্ন হয়, কেন?

আমি বলব, ভারতবর্ষের অবস্থা, আমি অনুভব করতে পারি এই প্রাচীন অমর বইখানায়।

থীব্‌স রাজ্য প্লেগে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল, তার কারণ ছিল রাজা লেয়াসের মৃত্যুর জন্যে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয় নি। অয়ডিপাস লেয়াসকে হত্যা করে থীবসের রাজা হয়েছে, বছরের পর বছর রাজত্ব করে যাচ্ছে, তার রাণী জোকাস্টা যে আসলে তার মা তাও সে জানে না। জানে না? নাকি জেনেও জানতে চায় নি অয়ডিপাস? থীব্‌সে আসার পর যখন প্লেগ লাগল অয়ডিপাস নিজেকে সরিয়ে নিল নির্লিপ্ততার

সংরক্ষিত কোণে। মড়কে দেশ ছারখার, অয়ডিপাস উদাসীন। নিজের চতুর্দিকে মিথ্যে জমে আছে, মুখোশধারীরা ঘিরে আছে অয়ডিপাসকে, কিন্তু সে জেনেও জানতে চাইছে না, স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে : এক বিরাট ভ্রষ্টাচার বন্দী ক'রে রেখেছে কাকে, রাজা অয়ডিপাসকে। অয়ডিপাস আর প্রকৃত বাস্তবের মধ্যে বাস করছে না, নকল বাস্তবের অলীক আলোকে সে নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে রাখতে চাইছে। কি ক'রে অয়ডিপাস মেনে নেবে প্রকৃত বাস্তবকে যার মধ্যে সে তার স্ত্রীর সন্তান, তার সন্তানদের সহোদর, ভাই ও বোনদের জনক, মার স্বামী? এই ভীষণ বাস্তবকে একবার স্বীকার করলে অয়ডিপাস কি আর বেঁচে থাকতে পারে? অয়ডিপাস যে তার জননীকে বিবাহ ক'রে তার স্বামী হ'য়ে বসেছে তার প্রধান কারণ কি জোকাস্টার প্রতি তার গভীর দুর্দম্য অবৈধ ভ্রষ্ট প্রেম? প্রেম নিশ্চয় কিছুটা আছে, কিন্তু অয়ডিপাসের প্রধান আকর্ষণ রাজত্বের ক্ষমতা, জোকাস্টা তার ক্ষমতার অস্ত্র। অথচ অয়ডিপাস জানে না যে সে আসলে ক্ষমতার জন্যেই নিজের মাকে স্ত্রী হিসেবে উপভোগ করছে, জানে না, তাই, 'অয়ডিপাস রেক্স' এক মহান ট্র্যাজেডি। নির্লিপ্ত, উদাসীন, অজ্ঞ ছিল অয়ডিপাস, কিন্তু অ্যাপোলো তাঁর দিব্যবাণী দিয়ে তাকে সজাগ ক'রে দিল। অ্যাপোলো এসে হঠাৎ উদিত হলেন অয়ডিপাসের বিবেক-রূপে, বহু বছরের সম্মোহন কেটে গেল অয়ডিপাসের। হঠাৎ সে সত্য আবিষ্কারের সংকল্পে উন্মত্ত হয়ে গেল। সত্য জানবার পর অয়ডিপাস আর অলীক বাস্তবকে দেখবার মত সাহস রাখতে পারল না। নিজেকে অন্ধ করে দিল রাজা অয়ডিপাস। অন্ধ হবার পর প্রকৃত দৃষ্টি পেল রাজা অয়ডিপাস।

এই দেশ, যার নাম ভারত, তাকেই আমরা ভ্রষ্টাচারে থীব্‌স বানিয়ে ফেলেছি। প্লেগ মহামারীর মত আমাদের জাতীয় জীবনের শ্বাসটুকু খেয়ে নিচ্ছে, আমরা তা দেখেও দেখতে চাইছি না।

জন্মভূমি যদি জননী হয়, আমরা সবাই মিলে এক অতিকায়

মহালোভী অশেষকাম অয়ডিপাস হ'য়ে সেই জননীকে রক্ষিতার মতো উপভোগ ক'রে যাচ্ছি, তার সবটুকু বৈভব, ঐশ্বর্য, কমনীয়তা আমাদের ভোগের ক্ষুধা নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে।

আমাদের চারিদিকে যে নৈরাজ্যের বাস্তব তৈরী হচ্ছে তা আমরা দেখতে প্রস্তুত নই। স্তুতি আর স্তাবকতা, ক্ষমতা আর অর্থ, লুঠ আর চুরি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিশ্বাস প্রশ্বাস হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের অয়ডিপাস ভারতবর্ষের শাসককুল। তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত নীলাচল ধর। আই-এ-এস। আমি।

বেশ ছিলাম। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জয়েণ্ট সেক্রেটারী। কমি-উনিস্ট সমস্যায় বিশেষজ্ঞ। বয়স পঞ্চাশ হ'তে এখনও তিন বছর দেরি, পঞ্চাশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী হ'তে পারলে বাহান্ন তিপ্পান্ন বছরে একেবারে সেক্রেটারী। আমলা জীবনের এভারেস্ট। অপরাজিতা ধর ঘন ঘন বিদেশ যাচ্ছে। কন্যা নিবেদিতা ধর স্কুলে প্রথম হচ্ছে। শ্বশুর মহাশয় নিজের তনয়ার মাধ্যমে বার বার জানিয়ে-ছেন চাইলেই আমি চলে যেতে পারি, অন্তত কয়েক বছরের জন্যে, লণ্ডন অথবা রোম অথবা জেনিভা কিংবা ওয়াশিংটন। একটা ইউ-এন অ্যাপয়েণ্টমেণ্টও এখন আর কল্পনা-বিলাস নয়। বেশ ছিলাম। আরও ভালো থাকবার বাতাবরণ তৈরী ছিল।

বাধ সাধল অ্যাপোলো। অন্ধ ঋষি টায়রেসিয়াস অয়ডিপাসের বিবেককে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে দিয়েছিল। আমাকেও সে হঠাৎ তচনচ ক'রে দিল।

কিতাবে লিখিত আছে, আমলারা সরকারের সেবক, এবং জনসাধারণের কোনও বিশিষ্ট পার্টির নয়, বিশেষ কোনও ব্যক্তির নয়। বাস্তবে, অন্তত ভারতবর্ষে তা কখনও হয় নি। ইংরেজ আমলে ভারতীয় আমলারা, কদাচ দু'একজন বাদে, শাসকদের খুশি রাখাটাকেই রাজ-কার্যের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ মনে করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর আমলাতন্ত্রের কর্তাভজন মানসিকতা প্রবল বেগে বেড়ে গেছে।

বলা যেতে পারে যে চীনের সঙ্গে সীমান্ত যুদ্ধ ভারত রাষ্ট্রের কুমারীত্ব ধর্ষণ করেছিল। এই বিষম ঘটনার জন্যে জহরলাল নেহেরু মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, অথচ এ যুদ্ধকে রুখবার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রয়াস৹ তিনি করেন নি। নেহেরুর রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা, ইংরেজীতে যাকে বলা যায় স্টেট্‌স্‌ম্যানশিপ. যে কতো দুর্বল ও ফাঁকা ছিল চীনের সঙ্গে সংঘাতে তা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ব্যাপারটার গুরুত্ব তিনি অনুধাবনই করতে পারেন নি। প্রথমত, খাম্পা ও লামা বিদ্রোহে ভারতবর্ষের ভূমিকা নিয়ে তাঁর মন বিভক্ত ছিল। তিনি জানতেন লামা আর খাম্পারা তিব্বতের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী, সাধারণ মানুষদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখে, এদের প্রভুত্ব। তথাপি এদেরই সহায়ক ও সমর্থকের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত নেহেরুকে নিতে হল! তিব্বতের ওপর চীনের দখল নিয়েও নেহেরুর মানসিকতায় বড় রকমের ফাটল ছিল। ভারতবর্ষের 'জাতীয়তাবাদী' শিক্ষিত, উচ্চ ও মধ্যবিত্তেরা তো চাইবেই যে তিব্বতে ভারতের অন্তত কিছুটা প্রভাব থাক। ১৯৫১-৫৪ এই সময়ের মধ্যে নেহেরু কার্যত তিব্বতে চীনের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। ১৯৫৯-৬১ সালে এ প্রশ্নকে পুনবায় তুলে ধরতে তিনি বাধ্য হ'য়ে ছিলেন অতিশয় উত্তেজিত পার্লামেণ্ট ও ততোধিক উত্তেজিত সংবাদপত্রগুলির চাপে। মন্ত্রিসভায়ও চাপ কম ছিল না। সীমান্ত নিয়ে চীন নেহেরুর সঙ্গে প্রথম থেকেই খল ব্যবহার ক'রে আসছিল। যেমন লাদাকের আকসাই-চিনের মাঝ দিয়ে মধ্যপঞ্চাশে সিংকিয়াং-তিব্বত রাজপথ নির্মাণের খবরটা, পঞ্চশীলের বন্ধুত্বে আবদ্ধ ভারতকে চীন অনায়াসে দিতে পারত। নেহেরু চীন সরকারকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের মতভেদ আছে, কিন্তু চীন সীমান্ত ব্যাপারটাকে প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও তুচ্ছ ক'রে ভেতরে ভেতরে আকসাই-চিনে নিজের অর্থাৎ তিব্বতের সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তৈরী ক'রে নিয়েছিল। তিব্বত নিয়ে বিরোধের সময় সীমান্ত সমস্যা যখন হঠাৎ বিস্ফোরিত হল, তখন নেহেরুর সর্বাগ্রে যা ভেবে

দেখা উচিত ছিল তা হল, সীমান্ত নিয়ে বড় রকমের সামরিক সংঘাতের জন্যে ভারত প্রস্তুত কি না। ভারত যে প্রস্তুত নয়, এ বাস্তব সত্যটা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর জানা উচিত ছিল, এবং তিনি জানতেনও। তবু কেন তিনি বার বার সীমান্ত সমস্যার মীমাংসার পথে এগিয়ে যেতে রাজী হলেন না। চীন সরকার তো অন্তত তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল, নেহেরু কেন তাঁর এক এবং অদ্বিতীয় প্রস্তাব থেকে নড়তে রাজী হলেন না। চ্যু এন-লাইকে ১৯৬০ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে ডেকে এনে তিনি কেন ভয়ঙ্করভাবে অপমানিত হ'তে দিলেন ? একের পর এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে ভাষায় তাঁদের বয়ান করলেন তা যে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নিষিদ্ধ তা কি নেহেরু জানতেন না ? অপমানে লাল হ'য়ে চ্যু এন-লাই চলে গেলেন কাঠমুণ্ডু। চীন-ভারতের বন্ধুত্ব শেষ হল সেই এপ্রিলেই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যিনি মন্ত্রী ছিলেন সেই ঘনঘটা দিনগুলিতে তিনি নেহেরুর দীর্ঘকালের বন্ধু ও সহকর্মী, কিন্তু চীন বিষয়ে ঘোরতর আপোস-বিরোধী। চ্যু এন-লাই যখন দিল্লীতে, তখন কৃষ্ণ মেননের মগজ থেকে একটা প্রস্তাব বেরিয়েছিল সীমান্ত সমাস্যাটার সমাধানের জন্যে। নেহেরু কৃষ্ণ মেননকে চ্যু এন-লাইএর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রকাশ্যে যোগ দিতে দেন নি : শুধু বিরোধী দলগুলিই নয়, কংগ্রেসের মধ্যেই অনেক নেতা তখন কৃষ্ণ মেননের মুণ্ডু দাবি করছেন। মেননের প্রস্তাব ছিল, ভারত দীর্ঘকালীন মেয়াদে আকসাই-চিন লীজ দেবে চীনকে পরিবর্তে নেফা ও সিকিম সীমান্তে কিছুটা জমি (ভারতের সীমান্ত প্রতিরক্ষার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ) চীন ছেড়ে দেবে ভারতকে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সমস্যাসমূহের মীমাংসার নজির থেকেই কৃষ্ণ মেনন তাঁর প্রস্তাবটি প্রস্তুত ক'রেছিলেন।

দেখা গেল, চ্যু এন-লাই মেননের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিরুৎসক নন। উভয় সরকার রাজী হ'লে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলতে পারে। চ্যু এন-লাই তাঁর সফরের শেষদিনে নেহেরুর জবাবের প্রতীক্ষায়।

নেহেরু প্রস্তাব নিয়ে হাজির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ভবনে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তখন তাঁর বিপুল দেহ কমোডে স্থাপন করে মলত্যাগে প্রবৃত্ত। এ কার্য সমাধা করা প্রতিদিনই তাঁর পক্ষে সময়সাপেক্ষ।

সময়ের অভাব। অগত্যা নেহেরু বাথরুমের বাইরে থেকেই মেননের খসড়া প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে শোনালেন, এবং জানতে চাইলেন, এ ধরনের সমাধানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মত কিনা।

প্রস্তাবের মূল কথাগুলি শুনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জবাব দিলেন, "আমি বেঁচে থাকতে এ ধরনের চুক্তি হ'তে পারে না, পণ্ডিতজী।"

সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের শেষ সুযোগও অপচিত হল।

১৯৬১-৬২ সালে, দেখা গেল, নেহেরুর গোটা হিসেবটাই ভুল হ'য়ে গেছে।

তিনি ভাবতে পারেন নি, সীমান্ত নিয়ে চীন বড় রকমের যুদ্ধ করবে।

ভেবেছিলেন, ছোট-মাঝারি সংঘাত হবে এখানে ওখানে, সমস্যাটা একসময় সমঝোতার পথে নিয়ে আসা যাবে।

নেহেরুর ভেবেছিলেন, সোবিয়েত চীনকে ভারত-আক্রমণ থেকে বিরত করতে পারবে।

তিনি বুঝতে পারেন নি, চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে ভারতকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানাবার অপরাধের জন্যে মাও সে-তুং কোনওদিন ক্ষমা করবেন না ক্রুশ্চেভকে। এ সমর্থনের শুধু একটাই অর্থ দেখতে পেয়েছিলেন মাও সে-তুং। তা হল: ক্রুশ্চেভ ও তাঁর সহকর্মীরা চীনকে আর সহ্য করতে পারছেন না, সহ্য করতে প্রস্তুত নন।

নেহেরুর গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছিল। তিব্বতের প্রকৃত অবস্থা, তিব্বতে চীনের সামরিক শক্তি ও ভারত-তিব্বত সীমান্তে চীনের সামরিক প্রস্তুতি, এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি সম্বন্ধেও নেহেরুর গোয়েন্দা বিভাগ নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি।

নেহেরুর সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান একদা দীর্ঘকাল পরম আনুগত্যের সঙ্গে ইংরেজ সম্রাটের সেবা ক'রেছিল। ১৯৬১-৬২ সালে এই ভদ্রলোক নিদারুণ দেশপ্রেমী হ'য়ে উঠলেন। এবং জঙ্গী চীন-বিরোধী। চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ বাধাবার জন্যে এর দায়িত্ব কম নয়। ইনি তিব্বত থেকে পলাতক রিফিউজিদের বর্ণনা ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে যে সব তথ্য নেহেরুকে সরবরাহ করলেন তার মধ্যে সত্য ও বাস্তব খুব বেশি স্থান পায় নি।

ইনি নেহেরুকে বোঝালেন, তিব্বতে এক বিরাট আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে গিয়ে চীনেরা হিমসিম খাচ্ছে। ভারতের বিরুদ্ধে বড় রকম কিছু ক'রে ওঠবার ক্ষমতা তাদের নেই।

আসলে তিব্বতে খাম্পা-লামা বিদ্রোহ দমন করতে চীনেদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। দালাই লামা বিদ্রোহের প্রথমেই ভারতে পালিয়ে এসে নিজের প্রাণ ও ধনরত্ন বাঁচাতে পেরেছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের ভবিষ্যৎ দিয়েছিলেন নষ্ট ক'রে। হাজার হাজার খাম্পাও ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিল। ভারত থেকে তিব্বতের বিদ্রোহীদের বড় রকম সাহায্য পাঠানো দালাই লামার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

নেহেরুর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান নেহেরুকে বুঝিয়েছিলেন, চীনেরা আক্রমণ করলেও সে আক্রমণকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আছে। সে ক্ষমতা যে তাদের একেবারেই ছিল না তার প্রমাণ যুদ্ধ বাধার দু চার দিনের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রকৃত শক্তি ও দুর্বলতা জানা একান্ত কর্তব্য ছিল।

আসলে নেহেরু চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের, চীনের কমিউনিজমকেই চিনতেন না, জানতেন না। সোভিয়েত কমিউনিজম্ সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। চীনে নেহেরুর আজীবন বন্ধু ছিল চিয়াং কাই সেক ও মাদাম চিয়াং কাই সেক।

১৯৩৫ সাল থেকে মাও সে-তুং চীন বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে আস-

ছিলেন। নেহেরু তাঁর 'বিশ্বইতিহাস প্রসঙ্গ' পুস্তকে মাও সে-তুং-এর সংগ্রামের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

ভারত ও কমিউনিস্ট চীনের মধ্যে "বন্ধুত্ব" ১৯৫৪ সালে জন্ম নিয়ে ১৯৫৯ সালে ম'রে গিয়েছিল!

নেহেরুর দৃষ্টিতে কমিউনিস্ট চীন ছিল গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ভারতের প্রধান প্রতিযোগী রাষ্ট্র। নেহেরু সোজা সরল চোখে কোনওদিন কমিউনিস্ট চীনকে দেখতে পারেন নি। দু'বার কমিউনিস্ট চীনে ভ্রমণকালে প্রতি মুহূর্তে তিনি কেবল চীনের সঙ্গে ভারতের তুলনা ক'রে গেছেন নিজের মনে মনে।

নেহেরু জানতেন, প্রায়ই একই সময় যাত্রা শুরু ক'রে, চীন প্রতি বছর ভারতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ যাত্রা শুরুর সময় চীনের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভারত অগ্রসর দেশ ছিল। চীন, নেহেরু জানতেন, গরীব মানুষদের দারিদ্র্যকে প্রথম প্রাণপণে আক্রমণ করেছে। ভারত, নেহেরু জানতেন, তা করে নি, কেননা তিনি ও তাঁর দল সে পথের পথিক নন। তথাপি সুযোগ পেলেই নেহেরু জোর গলায় দাবি করতেন, শেষ পর্যন্ত ভারত চীনকে ছাড়িয়ে যাবে, কেননা ভারতের পথ নৈতিক দিক থেকে, মানবতার দিক থেকে, উন্নততর পথ।

চীন-ভারত যুদ্ধ শুধু ভারতকে পরাস্ত করে নি। তার চেয়ে অনেক বেশি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত ক'রে দিয়েছে জহরলাল নেহেরুকে। অন্য কোনও দেশ হলে অক্ষমণীয় ভুল ও বিচ্যুতির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হত অথবা তিনি পদচ্যুত হতেন। ভারতবর্ষের ক্ষমা আর সহনশীলতা অপরিসীম, তাই নেহেরুর একটাও হয় নি। কিন্তু তিনি নিজেই ভেঙে পরলেন। ১৯৬২ সালের পরে নেহেরুর দেহ আরও বছর দু'এক টিকে রইল। ১৯৬৪ সালে তারও শেষ হ'য়ে গেল।

চীন-ভারত যুদ্ধ খতম ক'রে দিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—সি-পি-আই'কেও। নেহেরুর মত সি-পি-আই'এর শরীরটাও বছর দুই

টিকে রইল। তারপর ১৯৬৪ সালে সি-পি-আই ভেঙে দু'টুকরো হ'য়ে গেল।

চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের দু বছরের মধ্যে আরও একটি বিশিষ্ট মানুষের রাজনৈতিক তিরোধান হল। তার নাম নিকিতা ক্রুশ্চেভ।

কিন্তু এসব ঐতিহাসিক, ইতিহাস-বানানো ঘটনার সঙ্গে নীলাচল ধর আই-এ-এস'এর কি সম্পর্ক? কি সম্পর্ক এই কাহিনীর, যা আমি লিখতে বসেছি।

সম্পর্ক কি শুধু এইটুকু যে নীলাচল ধর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জয়েণ্ট সেক্রেটারী, এবং কমিউনিস্ট সমস্যায় বিশেষজ্ঞ?

তা নয়। সম্পর্ক দেখা গেল দিল তখনই যখন নীলাচলের বহু দিনের ঘুমিয়ে পড়া বিবেকটা হঠাৎ ঋষি টায়রেসিয়াস হ'য়ে উঠল। অন্ধ এসে খুলে দিল নিদ্রিত বিবেকের চোখ। কেটে গেল নীলাচল ধরের প্রাচীন নির্লিপ্ততা।

পঞ্চাশোর্ধ্বে হঠাৎ নীলাচলের দেহে মনে এক অভিনব উত্তেজনা প্রবাহিত হল। রক্তে সেই কলেজী কালের তারুণ্য। নীলাচল ধরের সন্দেহ হল সে জীবনে বুঝি প্রথম কোনও কন্যার প্রেমে পড়ে গেছে। চতুর্দিকে কোনও কন্যাকে দেখতে পেল না যার প্রতি সে প্রেমাসক্ত। অপরাজিতা ধর অনেক বছর পর নীলাচল ধরের হঠাৎ-জানা কামুকতায় বিস্মিত, বিরক্ত ও ক্রমে ক্রুদ্ধ হ'য়ে পড়ল। যে পুরুষটা আজ বছর দশেক মাসে নিয়মিত একদিনও ক্ষুধা নিয়ে কাছে আসে নি সে হঠাৎ প্রত্যেক রাত্রে কামার্ত হ'য়ে উঠলে কোন পতিব্রতা স্ত্রী তা বরদাস্ত করতে পারে?

ছোট ছোট ঘটনা নিয়েই নীলাচল ধরের এই নতুন যৌবনের শুরু।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের কাছ থেকে একটা 'টপ সিক্রেট' রিপোর্ট এল তিব্বতে চীনাদের 'বিপর্যস্ত' অবস্থার বর্ণনা বহন করে। যার মূল কথা: তিব্বতী বিদ্রোহ চীনাদের ভীষণভাবে বিপন্ন ক'রে

রেখেছে; প্রতিদিন শত শত চীনে খুন জখম হচ্ছে বিদ্রোহীদের হাতে; বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, শীঘ্র নিভে যাবার সম্ভাবনা নেই। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহের প্রভাব অনেক বেশি।

মন্ত্রকের সেক্রেটারী রিপোর্ট প'ড়ে খুশি হ'তে পারেন নি। অথচ তিনি জানেন, মন্ত্রী ঠিক এ ধরনের রিপোর্ট পেলেই খুশি হবেন সব চেয়ে বেশি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিব্বতে যা হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন, রিপোর্ট পড়লে মনে হবে, তিব্বতে ঠিক তাই হচ্ছে।

সেক্রেটারী ধুরন্ধর আমলা। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তিনি, তিনি যে-সে লোক নন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন। তাঁর নিজের স্বাক্ষর-বহ রিপোর্ট সম্বন্ধে হীন মন্তব্য করা সেক্রেটারীর পক্ষে সমীচীন হবে না ভবিষ্যতের রাস্তা খোলা রাখতে হবে।

অতএব সেক্রেটারী সেই 'টপ সিক্রেট' রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন 'কমিউনিস্ট আফ্যায়ার্স স্পেশালিস্ট' নীলাচল ধরকে।

রিপোর্ট প'ড়ে নীলাচলের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে কেউ দায়িত্বজ্ঞানহীন না হ'লে এ-ধরনের রিপোর্ট লিখতে পারে? নীলাচল ধরের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে তিব্বতে খাম্পা-লামা বিদ্রোহের শেষ আগুনটুকুও চীনেরা নিবিয়ে দিয়েছে ১৯৬০এর মধ্যেই। মাস তিনেক আগে দিল্লীর আমেরিকান দূতাবাস থেকে একটি সিক্রেট রিপোর্টও ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে তিব্বতে চীনা শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সোবিয়েত সরকারও যে-ক'টি গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছে তাতে একই কথা বলা হ'য়েছে। এমন কি তাইওয়ানে চিয়াং কাই-সেক সরকারের কাছ থেকে ভারত সরকার যে ক'টি রিপোর্ট পেয়েছেন মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে, তাতেও তিব্বতে বড় রকমের কোনও অশান্তির খবর নেই।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের নিচে, অতএব, নীলচল ধর তার বিশ্বস্ত সবুজ কালির পার্কার পেন দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরে বিদগ্ধ ইংরেজীতে যা লিখল তার বাংলা সারাংশ হল: "এই

রিপোর্ট কিছু তিব্বতী রিফিউজির কল্পনা-প্রসূত ব'লে মনে হচ্ছে। গম্ভীর বিবেচনার অনুপযুক্ত।"

সীলমোহর এঁটে রিপোর্টটা সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে দিয়েই নীলাচল ধর নিজের অফিস ঘরেই দাঁড়িয়ে উঠে একবার নেচে নিল। কী আনন্দ! ইচ্ছে হল এক্ষুনি ছুটে গিয়ে কাউকে জড়িয়ে ধরে। চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি বেঁচে আছি! তোমরা জানো? আমি বেঁচে আছি! আমি একটার পর একটা রাঘব শত্রু তৈরী করছি! আমি বেঁচে আছি!"

রিপোর্টটা প'ড়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নীলাচলের মন্তব্য জেনে রুষ্ট হ'লেও তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্টটা তিনি পাঠিয়ে দিলেন। মন্তব্যে লিখলেন "যদিও রিপোর্ট সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে না হবার কারণ রয়েছে, তথাপি এর অনেকটাই বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা ব'লে আমি মনে করি, এবং সীমান্ত নিয়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণের পক্ষে সহায়ক ব'লে আমার ধারণা।"

তিন দিন পরে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে রিপোর্ট ফেরত এল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন: "পড়লাম। তিব্বতী রিফিউ-জিরা আর নির্ভরযোগ্য খবরের উৎস নয়। এ রিপোর্ট আমাদের কাজে লাগবে না।"

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের কানে পৌঁছতে দেরি হল না। আমার অনুমান, তিনি তাঁর অন্যতম অধীনস্থকে প্রশ্ন করলেন, "এই নীলাচল ধরটা কে?"

সেই ব্যক্তি বলল, "ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর জামাই। সুপ্রিম কোর্টের সদ্য অবসর প্রাপ্ত জাস্টিসের ছোট ভাই।"

প্রধান বললেন, "তবু, একটু খোঁজখবর ক'রে দেখ তো! লোকটা নিশ্চয় তলে তলে চীনপন্থী কমিউনিস্ট!"

ভাঁটার পরে ঠিক জোয়ার লাগবার সময় সমুদ্রের তটে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পাবেন ঢেউগুলি ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে, আপ-নাকে ক্রমে ক্রমে পিছু হটতে হ'চ্ছে। অথচ এই পিছু হটাটা আপনার

পরাজয় মনে হবে না, বরং উল্লসিত সফেন তরঙ্গমালার বর্ধমান উচ্ছ্বাস আপনাকেও পুলকিত ক'রে তুলবে। সমুদ্র যদি জীবন হয়, জীবনের কাছে কতগুলি পরাজয়, বিজয়েরই নামান্তর।

আমারও তাই হল। জীবনের কাছে আমি মহা আনন্দে, পরম উত্তেজনার সঙ্গে হারতে লাগলাম। প্রতিটি আক্রমণ আমাকে ব্যথার চেয়ে উল্লাস দিল অনেক বেশি। আঘাতে আমার শরীর থেকে যে রক্ত ঝরল তার নাম অমৃত। ওরা নানা ভাবে আমাকে পেছনে হটাতে লাগল। আমি সানন্দে, বিজয়ের গর্বে পিছু হটতে লাগলাম।

১৯৬২ সালের গ্রীষ্মকাল। চীন-ভারত সীমান্ত নিদারুণ উত্তেজিত। নেহেরুর মানসিকতা খণ্ড-বিখণ্ডিত। নিয়তি তাঁকে অমোঘ আকর্ষণে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তিনি বুঝতে পারছেন, যে-কোনও উপায়ে যুদ্ধ এড়ানো একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার উন্মত্ত পার্লামেণ্ট, পাবলিক ও প্রেসের সম্মুখীন হ'লেই তিনি যাচ্ছেন বদলে। তাঁর আশেপাশে এমন কেউ নেই যাঁর নিরুত্তাপ, বাস্তব পরামর্শের জন্যে তিনি স্মরণ নিতে পারেন। নেহেরু দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না, নানাবিধ দুষ্ট শক্তি আর বুদ্ধি ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে একত্র হ'য়ে তাঁর প্রশাসনের ভিত্তিকে নরম ক'রে দেখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'য়েছে।

নেহেরুর নিজস্ব বৈদেশিক মন্ত্রকে পায়রাদের চেয়ে বাজপক্ষীদের প্রভাব অনেক বেশি। মন্ত্রকের ঐতিহাসিক বিভাগে প্রধান পুঁথিপত্র, মানচিত্র, চুক্তি, এমন কি কালিদাসের কাব্য, রসায়ন ও মহাভারত সমবেত ক'রে সীমান্ত সম্পর্কে ভারতের দাবিকে উচ্চাসনে দাঁড় করিয়েছেন। সীমান্ত এখন ভারতীয় মানসিকতার সঙ্গে মিলে-মিশে এক অদ্ভুত রসায়নে পরিণত, যেখানে যুক্তির চেয়ে প্যাশনের স্থান অনেক বড়। যদিও নেহেরুর সন্দেহ নেই (আমারও ছিল না) যে একমাত্র চুক্তি ও দলিলের কষ্টিপাথরে যাচাই হ'লে ভারতের দাবির কাছে চীনের দাবি দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা এখন আর চুক্তি-দলিলের বিষয় নয়। কোনও দিনও ছিল না, কেন না বেশ

কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল চীন তখনই আইনগতভাবে স্বীকার করে নি। ব্যাপারটা এখন দু'টি বিশাল দেশের আত্মমর্যাদা, আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, শেষ পর্যন্ত শক্তির, ক্ষমতার, সংকল্পের দৃঢ়তার কষ্টিপাথরে এর অন্তিম যাচাই হ'তে বাধ্য।

যুদ্ধের ছায়া প্রলম্বিত হচ্ছে, তথাপি নেহেরু তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রককে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জরুরী হুকুম দিয়েছেন ভারত ও চীন থেকে সীমান্ত মীমাংসার যে-সব প্রস্তাব উঠেছে সেগুলি খুব ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিশ্লেষণ করা হোক। নেহেরু লিখেছেন, "আমি জানতে চাই দুই মন্ত্রকের উচ্চতম অফিসররা প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কি মনে করেন। চীন কি মীমাংসার চেয়ে ভারতের চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে? না-কি ভারতের আগ্রহ যে বেশি তা প্রস্তাবগুলিতে প্রকাশিত? আয়ত্তের মধ্যে আপোসের সুযোগ ব্যবহার করতে না পারার ফলে চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাধুক, এ আমি চাই নে। ভারত ও চীনের যুদ্ধ এশিয়ার। এমন কি বিশ্বের রাজনীতি বদলে দেবে। অন্যদিকে জাতীয় সম্মান ও স্বার্থ বিসর্জন দেবার কথাও আমাদের মনে উঠতে পারে না। আমার ইচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকজন অফিসর খোলা মনে, নির্ভয়ে, উভয় পক্ষের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে তাঁদের মতামত আমাকে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে জানান।"

পনের জন 'নির্দিষ্ট অফিসর'দের কাছে নেহেরুর আদেশ পৌঁছল। তার মধ্যে একজন নীলাচল ধর!

পরে জানা গেল, চৌদ্দজন অফিসর একবাক্যে নেহেরুকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্যে ভারতের প্রস্তাবগুলি চীনের প্রস্তাবগুলির চেয়ে অনেক বেশি ন্যায্য, বাস্তব এবং উদার। ভারত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছে তার প্রস্তাব-গুলিতে। ভারতের পক্ষে করণীয় আর কিছু নেই। পরবর্তী ঘটনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে চীনের।

শুধু একজন অফিসর ভিন্নমত প্রকাশ করেছিল। তার নাম নীলাচল ধর। আমি।

উভয় তরফের প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আমি মন্তব্য লিখেছিলাম, "দেখা যাচ্ছে, চীন সরকার তিনটি বিকল্প প্রস্তাব রেখেছেন, আর ভারত সরকার রেখেছেন মূলত একটি অনড় অটুট প্রস্তাব। এতেই অবশ্যি প্রমাণিত হয় না যে চীন ভারতের চেয়ে সীমান্তে যুদ্ধ না-ঘটতে দেবার জন্যে বেশি আগ্রহী। বিচার ক'রে দেখতে হবে চীন কর্তৃক ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হবার সম্ভাবনা আদৌ রয়েছে কিনা। দেখা যাবে, সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তখন বিচার্য বিষয় হবে চীনের কোনও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা ভারতবর্ষের পক্ষে লাভজনক হতে পারে কিনা। এ প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে আগে অন্য আর একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তা হল, চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে যুদ্ধ বাধলে ভারতের জয়লাভ নিশ্চিত কিনা। এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতারাই শুধু দিতে পারেন। জয় যদি নিশ্চিত হয়—অন্তত যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে—তাহলে সীমান্ত নিয়ে শক্ত মনোভাব গ্রহণ করাই ভারতের পক্ষে ঠিক হবে। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেলে ভারত যদি পরাজিত হয় তাহ'লে যে ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে তাকে রোধ করার জন্যে চীনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে কোনও একটিকে অন্তত সাময়িকভাবে গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে সমীচীন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

"পরিশেষে আমি যোগ করতে চাই যে যদিও আমার সামরিক জ্ঞান ও তথ্য সীমিত, তথাপি আমার দৃঢ় ধারণা সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে বড় রকমের সামরিক সংঘাতের জন্য ভারত প্রস্তুত নয়। আমার এ-ও বিশ্বাস যে যদি যুদ্ধ লেগেই যায়, চীনেরা তাকে 'খেলনা-যুদ্ধ' ক'রে রেখে দেবে না।"

এই নোট লেখার চারদিন পরে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সেক্রেটারীকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন, "তোমার জামাইটি বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিন্তু আর একটু বেশি দেশপ্রেমিক হ'লে তার নিজের ও আমাদের সবাকার ভালো হত।"

শ্বশুরমশাই'র সঙ্গে আমার কথাবার্তা হত খুব কম, যা হত তাও নিতান্ত মামুলি। তিনি বার বার আমা দ্বারা হতাশ হ'য়ে আমার সম্বন্ধে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি শুধু বিদেশে পোস্টিং নিয়ে তাঁর কন্যার সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে রাজী হই নি তা নয়, দেশে বাস ক'রেও, গভর্নমেণ্টের সেবায় আমি আশানুরূপ আনুগত্য ও উগ্রতা দেখাতে পারি নি। আমার কন্যা নিবেদিতার বিলেতে অথবা আমেরিকার উচ্চশিক্ষার পথ সুগম ক'রে তোলবার জন্যেও আমি কোনও আগ্রহ দেখাই নি। শ্বশুরমশাইও তাঁর কন্যার আমার প্রতি সদয় হবার কোনও কারণ ছিল না।

অপরাজিতা ধর অবশ্যি ভারত-চীন যুদ্ধ লাগাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলেন। তিনি যে হঠাৎ এতো উগ্র রকমের দেশপ্রেমী হ'য়ে উঠবেন, এমন ভয়ানকভাবে চীন বিরোধী, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আমার বিশ্বাস ছিল, গুড লিভিং ছাড়া অন্য বিষয়ে অপরাজিতা ধরের বিশেষ উৎসাহ নেই, রাজনীতিতে তো নয়ই। স্বামীরা স্ত্রীদের পরিচয় কতো সামান্য রাখে তার প্রমাণ পেয়ে পেলাম আমি। অপরাজিতা ধর সিটিজেন্‌স্ কমিটির প্রটেকটিং ইণ্ডিয়ান টেরিটরি'র যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে হামেশাই জনসভায় বক্তৃতা, বেতারে ভাষণ, সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশব্যাপী যুদ্ধং দেহি বাতাবরণ সৃষ্টির বিরাট উদ্যোগে সোৎসাহে শামিল হ'লেন। বাড়িতে আমি তাঁর চেহারাই দেখতে পেতাম না বলা চলে। সকালে এক সঙ্গে ব্রেক ফাস্টের পর তিনিই আগে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যার অনেক পরে। রাত্রিতে আমি প্রায়ই নিবেদিতার সঙ্গে আহার সেরে নিতাম। অপরাজিতা ধরের প্রায়ই পার্টি, মিটিং, জরুরী আলোচনা, বেতার বক্তৃতা এসব থাকত। আমাদের শয়ন যে আলাদা ছিল, আমার বেশি রাত জেগে বই পড়ার অভ্যেস। শুনতে পেতাম অপরাজিতা ধর বাড়ি এসেছেন, কখনও আহার করছেন, নিবেদিতার সঙ্গে দু চারটে বাক্যালাপ করছেন, নিজের শোবার ঘরে চলে গেছেন।

ভারত-চীন যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে অপরাজিতা ধর জোয়ানদের সেবার কাজে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন শিলং। আসাম রাজ্যের জনসাধারণের মনোবলকে অটুট রাখবার জন্যে অপরাজিতা ধরের শিলং-এ উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ল।

যুদ্ধের ফলাফল কি হল তা বলবার দরকার নেই।

দরকার আছে নীলাচল ধরের কি হল তা বলবার।

১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে নীলাচল ধরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী হবার কথা ছিল। সেটা হল না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাকে প্রশাসনের যোগ্য মনে করলেন না। একটু অনুসন্ধান ক'রে নীলাচল জানতে পারল, প্রধানমন্ত্রীও তার ওপর মোটেই সদয় নয়।

আনন্দে আটখানা হ'য়ে গেল নীলাচল ধর। আনন্দের উত্তাপ তার হৃৎপিণ্ড সইতে পারল না। হঠাৎ একদিন দুপুরে দপ্তরে বসেই নীলাচল ধর অজ্ঞান হ'যে গেল। অ্যাম্বুলেন্স এসে ওকে নিয়ে গেল অল-ইণ্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে। হার্ট অ্যাটাক। মাইল্ড-টু-মিডিয়াম।

অপরাজিতা ধর বিশ্বব্যাপী ভারতীয় কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে এক মহিলা ডেলিগেশনের নেত্রী হ'য়ে সিংহল গিয়েছিলেন। চীন কী জঘন্যতার সঙ্গে, কী নীচ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে, ভারতের ওপরে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল সিংহলের নারী সমাজকে তা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন অপরাজিতা ধর।

ভাগ্যিস আমি খুব বেশি সময় অজ্ঞান ছিলাম না! নিবেদিতা যখন খবর পেয়ে আমাকে দেখতে হাসপাতালে এল, তখন আমার জ্ঞান পুরোমাত্রায়। তাকে আমি বলেছিলাম, মাকে তার পাঠিয়ে ব্যতিব্যস্ত করার দরকার নেই। তিনি গেছেন দেশের কাজে, অনেক বড় দায়িত্ব নিয়ে, 'তার' পেয়ে ছুটে চলে এলে সে কাজ অপূর্ণ থেকে যাবে। তা ছাড়া, ভয় নেই, আমি মরছি না।

নিবেদিতাকে কোনও দিন সুযোগ দিই নি আমি আমাকে ভালো ক'রে জানবার, চেনবার। দূরত্বের নীরব ব্যবধান আমিই তৈরী ক'রে রেখেছি। আজও সে ব্যবধান হয়ে গেল। নিবেদিতা কিছু একটা বলতে গিয়ে, বলল না, চুপ ক'রে গেল। একটু পরে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী আলাদা আলাদা দেখতে এলেন আমাকে। শ্বশুর তাঁর দপ্তর থেকে, শাশুড়ী তাঁদের বাসভবন থেকে। আমার স্পেশাল নার্সের ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। সবকিছু দেখে মোটামুটি আশ্বস্ত হ'য়ে তাঁরা চলে গেলেন। নিবেদিতাকে আমিই তার দিদার সঙ্গে চলে যেতে বললাম। আবার কিছু একটা বলতে গিয়ে নিবেদিতা নিজেকে চেপে নিল, বলল না, আমার দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য ক'রে, দিদার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আমি তো বেঁচে গেলাম, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বাঁচলেন না। ১৯৬৪ সালে তাঁর স্বর্গলাভ হল।

দুম ক'রে একদিন দু'টুকরো হ'য়ে গেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। যারা সি-পি-আই থেকে বেরিয়ে গেল, তারা নাম দিল সি-পি-আই (এম)। সি-পি-আই চেঁচিয়ে উঠল : ওরা চীনা পন্থী, দেশদ্রোহী। সংবাদপত্রগুলিও সে চিৎকারের প্রতিধ্বনি ক'রে গেল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে আমি তখনও "কমিউনিস্ট আফায়ার্স স্পেশালিস্ট।" মন্ত্রীর ইচ্ছে, চীনপন্থী সব কমিউনিস্টদের জেলে আটকে রাখবার। নতুন প্রধানমন্ত্রী কিছুটা ইতস্তত করছেন, অতএব "বিশেষজ্ঞে"র মতামত আহ্বান করা হল।

আমি লিখে দিলাম, আজ যারা নিজেদের সি-পি-আই (এম) বলছে, তারা চীনপন্থী নয়। চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে এঁদের ধারণা খুব কম, চীনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এঁরা প্রকৃতপক্ষে সোবিয়েত-প্রেমী। কিন্তু এঁরা সোবিয়েত রাশিয়ার হুকুম মত চলতে রাজী নয়। চীনের হুকুম মতও নয়। এঁরা চাইছেন ভারতবর্ষে একটা 'স্বাধীন' কমিউনিস্ট আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে।

"গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে সোবিয়েত বা চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ে একটি সত্যিকারের স্বাধীন জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পক্ষে অনেক বেশি বিপজ্জনক। যদিও এ বিপদ দানা বাঁধতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

"যাঁরা নিজেদের সি-পি-আই (এম) বলছেন, তাঁরা চীন সোবিয়েত বিরোধজনিত তাবৎ আদর্শগত ও পথ-সংক্রান্ত বিতর্ককে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছেন। এই কাজ তাঁদের পক্ষে বড় রকমের ভুল বলে আমি বিবেচনা করছি। দেখা যাবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই সি-পি-আই (এম)'এর উদর থেকে জন্ম নেবে ঠিক ঠিক চীনপন্থী তৃতীয় কমিউনিস্ট দল।

"সরকার যদি সি-পি-আই (এম) নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার ক'রে নেন তাহ'লে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, জেলের ভেতরে স্থান পেয়ে এই দলের নেতারা কতগুলি অপ্রিয় সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখবার সুযোগ পাবেন। জনসাধারণ যদি এদের চীনপন্থী মনে করে, তাহলে এদের সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে না। যে কাজটা জনসাধারণ দ্বারা হবার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে তা সরকার নিজের হাতে করতে যাবেন কেন ?"

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমার মতামতকে পাত্তা দিলেন না। সি-পি-এম'এর বেশ কিছু নেতা ও কর্মীদের জেলে পুরে দেওয়া হল।

আমার চাকরি-জীবনের কপালে আর একটি কাঁটা পড়ল।

কিন্তু সরকারের দল সাধারণত চলে ধীর মন্থর গতিতে। নীলাচল ধরের পায়ের তলা থেকে জমি স'রে যেতে আরও চার বছর কেটে গেল।

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা ঠিক হবে কিনা এই প্রশ্ন উঠল স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকে। আমি নোট দিলাম, ঠিক হবে না। কেন ঠিক হবে না তা বুঝিয়ে লিখতে আমার পুরো দু'দিন সময় লাগল।

যুক্ত-ফ্রণ্ট সরকার উৎখাত হল। উৎখাত হলাম আমিও।

ক্যাবিনেটের উচ্চতম মহলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল : নীলাচল ধরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে রাখা বিপজ্জনক।

বিনয়কুমার বসু আই-সি-এস ক্ষেপে গেলেন। ক্ষেপে গেল অপরাজিতা ধর। আমি এ ভাবে নিজের পায়ে কুড়াল মারলাম কেন? কেন একটা সম্ভাবনা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করলাম।

আমার বদলির অর্ডার হ'য়ে গেল। কিন্তু পোস্টিং নেই। কোনও মন্ত্রক নিতে চায় না নীলাচল ধরকে। আমাকে বলা হল, তুমি তিন মাসের ছুটি নাও।

আমি এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করলাম।

অশোকা হোটেলের বুক-স্টলে গিয়ে একদিন একটা লোককে দেখতে পেলাম। আমি 'ফরেন পলিসি' ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম। হঠাৎ ঘাড়ের ওপর কারুর নিশ্বাস পড়ল। তাকাতেই লোকটাকে চিনতে পারলাম। কিছুদিন আগে মস্কোর এক অনুষ্ঠানে এই লোকটা সোনার মেডেল পেয়ে এসেছে। এরই দলের এক এম. পি. প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছে, হোম মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারী নীলাচল ধর চীনের দালাল। লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করল। আমার শরীর ভালো নয়। হঠাৎ ভীষণ বমি পেয়ে গেল। ডাস্টবিনে থুথু ফেলে আমি অশোকা হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলাম।

আমার একবার হার্ট অ্যাটাক হ'য়ে গেছে। আবার হ'তে পারত। ঘরে-বাইরে পরিবেশ ভালো নয়? কিন্তু হল না। তার কারণ আমি হঠাৎ একটি বন্ধু পেয়ে গেলাম। ছাব্বিশ বছরের যুবক বন্ধু। তরতাজা জোয়ান জীয়ন্ত বন্ধু।

তারও নাম নীলাচল ধর। ছাব্বিশ বছর বয়সে সে ম'রে গিয়েছিল। অনেক বছর আমি তার শবদেহ আর প্রেতাত্মা বহন ক'রে আসছিলাম। একদিন শব ও প্রেতাত্মা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখন

নীলাচল ঘর ফিরে এল। সে আমার নিত্য-সহচর। তার সঙ্গে কথা বলেই আমার এক মাস কেটে গেল।

'তুমি ওসব কথা লিখতে গেলে কেন?' যুবক নীলাচল জানতে চাইল।

'হঠাৎ কী যেন ঘটে গেল আমার মধ্যে, আমি বললাম। 'মনে হল, আর মিথ্যের বেসাতি করব না। যা বিশ্বাস করি, যা সত্য মনে করি, তাই লিখব।' আমি আনন্দে আটখানা হ'য়ে গেলাম।

'মিথ্যের জতুগৃহ সত্যের আগুন লেগে জ্বলে যাবে ভাবলে?'

'না, তা ভাবি নি। শুধু মনে হল, আমি আর মিথ্যে লিখব না।'

'তুমি কি সত্যি মনে করো এবার সংগ্রাম ঠিক পথে চলবে?'

'আমি শুধু মনে করি, এবার ঠিক পথ ধরা হয়েছে।'

'কেন মনে করো?'

'প্রথম কারণ, এ পথ স্বাধীনতার পথ। স্বাধীন, নিজেদের তৈরী, পথে না গিয়ে কোনও সংগ্রাম কোনও দেশে বিপ্লব করতে পারে নি। প্রতিটি সার্থক বিপ্লব সার্বভৌম। মস্কো অথবা চীনের পথ হতে পারে না। দেখতে পাচ্ছ না, ভিয়েৎনামের মতো, ক্যুবার মতো ছোট্ট ছোট্ট দেশও নিজেদের পথে চলেই সার্থক বিপ্লব করতে পেরেছে?'

'আর কি কারণ?'

'দ্বিতীয় কারণ, গ্রামের গরীব ও দুর্বল মানুষদের এবার সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

'আগেও হ'য়েছে।'

'অনেক আগে। তিন দশকের শেষের দিকে, চার দশকে। বাহান্ন সালের পরে আর নয়। কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামের দরিদ্র মানুষই বিপ্লবের প্রধান বারুদ।'

'তার মানে তুমি চীনের পথ ধরছ।'

'না। চীনের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, রাজনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি ভারতবর্ষ থেকে একেবারে আলাদা। চীন পারে না ভারতবর্ষকে

বিপ্লবের পথ দেখাতে। যেমন পারে না সোভিয়েত রাশিয়া। কিন্তু, ভারতীয় সংগ্রামকে শিখতে হবে সব সফল ও পরাজিত সংগ্রাম থেকে।'

'কিন্তু সংগ্রাম তো এখনও পার্লামেণ্টারী পথেই চলছে।'

'চলুক। পার্লামেণ্টারী রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ না করলেই হল। গণসংগ্রাম ও নির্বাচনের মাধ্যমে সংগ্রাম একসঙ্গে চলতে পারে। ভারতবর্ষের সামনে অন্য পথ নেই।'

'সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম? গেরিলা যুদ্ধ?'

'কোনওদিন হলেও হতে পারে। তবে, পরিবেশ নেই ভারতবর্ষে। অন্তত এখন নেই, আরও অনেক কাল তৈরী হবে না।'

'সংগ্রামের নেতারা তো এখনও ভদ্রলোক।'

'সংগ্রাম এখনও দুর্বল। অনেক ত্রুটিপূর্ণ। নেতারা শুধু ভদ্রলোক নয়, হলেও দোষ নেই, নেতারা এখনও দ্বিধাবিভক্ত, এখনও বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত নয়। তার চেয়ে বড় কথা, ভারতবর্ষের মাটিকে তারা এখনও চেনে না। ভারতবর্ষ শুধু কেরল আর পশ্চিমবঙ্গ নয়। ভারতবর্ষ আসাম-বিহার-উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-রাজস্থান-গুজরাট-মহারাষ্ট্র-দাক্ষিণাত্য। একটা দেশ নয়, অনেকগুলি দেশ নিয়ে একটা জাতি। সমাজ সংস্কৃতি ভাষা মানসিকতা সব কিছুতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন। এদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্পত্তি-সম্পন্ন লোকেদের একত্র করা সহজ। কোটি কোটি দরিদ্র সাধারণ মানুষদের একত্র করা মোটেই সহজ নয়?'

'তুমি চেন ভারতবর্ষকে?'

'না।'

'কারা চেনে?'

'ভারতবর্ষ তো একটা নয় যে তোমার প্রশ্নের সহজ জবাব দেওয়া যেতে পারে। প্রাচীন সনাতন ভারতবর্ষকে চেনার লোক অনেক আছে। ধর্মের ভারতবর্ষ, অদৃষ্টবাদের ভারতবর্ষ, জাতিভেদ ও জাতি-শাসনের ভারতবর্ষ, 'সমন্বয়' আর 'ত্যাগে'র ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষকেই আমরা চিনে এসেছি, আমাদের চেনানো হয়েছে। তারপর আমরা

আবছা আবছা চিনেছি ইতিহাসের ভারতবর্ষকে—সম্রাট ও রাজাদের ভারতবর্ষ, একের পর এক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, অন্তহীন যুদ্ধ আর রক্তপাত, বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে পরাজয় ও দাসত্ব, বিদেশীদের দেশী করে নেওয়া ভারতবর্ষ। ধর্মের সংঘাত, সংস্কৃতির সংঘাত, রাজ্যে রাজ্যে লড়াই, ভারতবর্ষের ইতিহাস অবিরাম অশ্বখুরের আর বন্দুকের শব্দের ইতিহাস। এরই মধ্যে কিছু কিছু বিস্ময়কর সৌন্দর্য সৃষ্টি—তক্ষশিলা থেকে তাজমহল। তারও চেয়ে অনেক বেশি বৈভবময় ভারতবর্ষের সঙ্গীত, নৃত্য, প্রকৃতি; এবং সাহিত্য। এ ভারতবর্ষকে আমরা চিনি, আমাদের চেনানো হয়েছে, হচ্ছে, কখনও বিকৃতভাবে। আমরা আরও চিনি ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষিতদের ভারতবর্ষকে, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিলিয়ে দুধে-জলে তরল এক ভারতবর্ষ। একদিকে আত্মগরিমায় স্ফীত, অন্যদিকে মানসিকতায় পরনির্ভর। সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষকেও আমরা চিনি—সবচেয়ে ভালো করে চিনতেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি তার আমূল পরিবর্তন ভাবতে পর্যন্ত পারতেন না। কিন্তু আমাদের চেনার এখানেই সমাপ্তি। এই বাইশ বছর ধরে যে ভারতবর্ষ তৈরী হচ্ছে তাকে আমরা চিনি না। কি গড়বার নামে কি আমরা গড়ে তুলেছি তা কি আমরা জানি? যাকে গণতন্ত্র বলে চালাচ্ছি তা আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৈষম্যদূষিত সমাজ। যে পটে সমন্বয়ের ছবি আঁকছি আসলে সেখানে অনন্ত প্রাচীন সংঘাত সংঘর্ষের বিষবীজ অঙ্কুরিত হয়ে বসে আছে। এই প্রাচীন সমাজের স্তরে স্তরে বহু বহু ঐতিহাসিক হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা জমে আছে, শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অত্যাচার আর শোষণ আর মানুষের হাতে মানুষের অবমাননার হলাহল, তাকে পান করে দেশকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারে এমন নীলকণ্ঠ ভূমিষ্ঠ হন নি। এই আধুনিক ভারতবর্ষকে আমরা চিনি না, চিনতে চাইও না। কোনওমতে এই দৈত্যটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারলেই আমরা সংরক্ষিত। স্বাধীনতা সংগ্রাম যে সংহতি তৈরী করেছিলে, উচ্চশিক্ষিত বিত্তবান ভদ্রলোকদের সংহতি,

এবং তার সঙ্গে মিশিয়েছিল পুঁজিপতি আর ভূস্বামীদের স্বার্থ, সে সংহতির এখন নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। আমি শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে ভারতবর্ষের সামনে এখন দীর্ঘ সংঘাত-সংঘর্ষের যুগ, নগরে, শহরে, গ্রামে, নানা স্তরে বহু রকমের সংঘাত সংঘর্ষ এখন বিস্ফুরিত হবে, অনেক ঘৃণা, অনেক হিংসা, অনেক লোভ আর অনেক প্রবঞ্চনা হাতাহাতি করবে হিসেব মেলাবার জন্যে। এরই মধ্যে যারা বিপ্লবী পরিবর্তনের সংগ্রাম করবে তাদের রাস্তা খুঁজে নিতে হবে, রাস্তা তৈরী করে নিতে হবে, বাইরে থেকে কেউ এসে রাস্তা বানিয়ে দিতে পারবে না। বিপ্লবী পরিবর্তনের নেতৃত্ব তখনই সাধারণ মানুষের কব্জায় আসতে পারে সুদীর্ঘ সংগ্রামে যখন আমাদের সাধারণ মানুষ শামিল হয়, সংগ্রামকে তারা নিজেদের মুক্তি-যুদ্ধ হিসেবে চিনতে পারে, গ্রহণ করতে পারে।'

'তোমার মতে সে সংগ্রাম এখন শুরু হয়েছে?'

'প্রথম পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি আমি। শুধু প্রথম দুটি পদক্ষেপ। এক, স্বাধীনতা। পরনির্ভরের অবসান। দুই, গ্রামের মানুষদের সংগ্রামের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে নিয়ে আসা।'

'এর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?'

'এর সঙ্গে আমার শুধু একটাই সম্পর্ক। তা হল তুমি।'

'আমি? আমি তো মরে গেছি ছাব্বিশ বছর বয়সে।'

'যদি মরে গেছ, তবে তুমি আবার আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছ কেন?'

'মরা সরস্বতী জীবন্ত গঙ্গার বন্ধু হতে পারে?'

'পারুক আর না পারুক, নদী আছে, নদী থাকবে! তার বহমানতা শেষ হবে না কোনও দিন।'

॥ নয় ॥

অপরাজিতা ধরের মধ্যবয়সী পতিসেবাও আমাকে সহজে স্বখাত সলিল থেকে তীরে তুলে আনতে পারল না। এক মাস শেষ হলেও পোস্টিং হল না আমার। আর এক মাস ছুটি নিতে বাধ্য হলাম। ছুটি শেষ হবার চারদিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সেক্রেটারীর ঘরে আমার ডাক পড়ল।

দেশের মানুষ জানে না, কেন্দ্রীয় সরকারের দানবাকার আমলাযন্ত্রটি চালায় আধ-ডজন মহারথী আমলারা। গোটা ভারতবর্ষে এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ক্লাব আর নেই। কোনও মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সাধ্য নেই এই ক্লাবকে দুর্বল করে দেবার; এই ক্লাবের সভ্যরা মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর, এবং এদের হাতে রয়েছে সেই অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র, যার নাম 'নিয়ম'। 'রুলসে'র নজীর দেখিয়ে এরাই আসলে গোটা দেশটাকে রুল করে, অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের পথে এরাই দুর্ভেদ্য অবরোধ তুলে দেয়। এরাই বছরের পর বছর আমলাযন্ত্রকে শক্তিশালী করে এসেছে, করছে, করে যাবে। আর ক্রমবর্ধমান আমলাযন্ত্রের চাবিকাঠি এদেরই হাতে। এরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রথম নামে ডাকে, দেখা হলে স্ত্রীপুত্রকন্যার খবর নেয়, এরাই হল ভারতবর্ষের মোস্ট পাওয়ারফুল ফ্রাটারনিটি।

আমি হঠাৎ এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা কেস হয়ে দাঁড়িয়েছি যে আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার পড়েছে এই মহারথীদের ওপর। এরাই শলা-পরামর্শে ঠিক করেছে আমাকে কী রকম শাস্তি দেওয়া হবে। এদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার জন্যে স্বরাষ্ট্র সচিব আমাকে হাজির হতে আদেশ দিয়েছেন।

আমি হাজির হয়েছি।

আমার ভাগ্যবিধাতার ভ্রূ পেকেছে, কিন্তু মাথার চুল কালো। নির্ঘাত কলপ ব্যবহার করেন। লম্বা মজবুত শরীর, উদর হ্রস্ব, হাড়ল মুখ, কোটরাগত চক্ষু, দৃষ্টি কর্কশ, ঝাঁঝাল। নাকের গহ্বরে ইঁদুর ঢুকে যেতে পারে অনায়াসে। লোমশ বাহু, চার আঙুলে চারটি পাথরের আংটি। একদা-রুদ্রপ্রতাপ আই-সি-এস কৌলিন্যের শেষ অবশিষ্ট চারজনের একজন ইনি। দু বছর পরে ইনিও অবসর নেবেন। অর্থাৎ হয় গভর্নর, নয়তো কোনও মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর ডিরেক্টর হবেন।

যেমন নিয়ম, আমাকে সাঁইত্রিশ মিনিট বসিয়ে রাখবার পর হোম সেক্রেটারী ডেকে পাঠালেন।

কোনও অভিবাদন নয়, হস্তমর্দন নয়, কুশল প্রশ্ন নয়। আমি মৃদু স্বরে 'গুড আফটারনুন' ব'লে বিনা আমন্ত্রণে কুরসি গ্রহণ করলাম।

তিনি, যেমন 'নিয়ম', কোনও একটি মহামূল্য দলিল পাঠ করছিলেন। পাঠ শেষ ক'রে আমার ওপরে দৃষ্টিপাত করলেন।

একটু চেষ্টা ক'রে আমার 'কেস'টা স্মরণ করতে হল তাঁকে।

'ও, হ্যাঁ, মিঃ ধর। আপনার পোস্টিং।'

আমি তখন কিং লীয়ারের মত 'প্যাটার্ন অব পেসেন্স্' হ'য়ে ব'সে আছি।

তিনি নাক থেকে চশমা সরালেন। কর্কশ ঝাঁঝালো দৃষ্টি ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল একটু। তিনি পাইপ তুলে নিয়ে সুদর্শন লাইটার দিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। তিনি দু'বার পাইপে টান দিয়ে ধূম্রপান করলেন।

আমি চোখের সামনে রঙিন উড়ন্ত প্রজাপতি দেখতে লাগলাম।

অবশেষে তিনি বললেন, 'মিঃ ধর, চারদিন পরে আপনার দ্বিতীয় মাসের ছুটি শেষ হবে। আপনি কি ছুটি বাড়াবেন?'

আমি বললাম, 'আমি ছুটি চাই নি। ছুটি নিতে আমাকে বাধ্য করা হ'য়েছে। আপনারা কি আরও ছুটি নিতে আমাকে বাধ্য করবেন?'

তিনি বললেন, 'দরকার হবে না, যদি আপনি আমাদের নির্দেশ মেনে নেন। আপনাকে আমরা একটা পোস্টিং দিচ্ছি। নিশ্চয় জানেন, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটা 'সেণ্ট্রাল বোর্ড অব চ্যারিটেবল ট্রাস্টস্' স্থাপন করেছেন। আমরা আপনাকে তার সেক্রেটারী নিযুক্ত করেছি।'

'কিন্তু ওটা তো ডেপুটি সেক্রেটারী পোস্ট!' আমি আঁতকে উঠে বললাম।

'নট রিয়েলি। আপনার মাইনেপত্র সব ঠিকই থাকবে।'

'আমি যদি এই পোস্টিং গ্রহণ না করি?'

আমার ভাগ্যবিধাতা পুনরায় পাইপে অগ্নিসংযোগ ক'রে ধূমপানে নিজেকে সমাহিত ক'রে বললেন: 'আপনার অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট অর্ডার ইস্যু হ'য়ে গেছে। এখন আপনার সামনে তিনটি পথ খোলা। এক, আপনি ঐ কাজে যোগ দিতে পারেন। দুই, আপনি আদালতে যেতে পারেন। তিন, আপনি আপনার রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে আবেদন করতে পারেন এবং সে আবেদনের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ছুটি বাড়াতে পারেন।' পুনরায় পাইপে ডুবার টান দিয়ে আমার ভাগ্যবিধাতা করুণার সঙ্গে বললেন, 'আপনার স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করে আমার ব্যক্তিগত উপদেশ হল, আপনি পোস্টিংটা নিয়ে নিন। কাজকর্ম খুব হালকা। প্রায় অবসর জীবনই যাপন করতে পারবেন।'

আমি এবার প্রশ্ন করলাম, 'আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কি? আমাকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন?'

ভাগ্যবিধাতা উদার ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন, 'ওসব ব্যাপারে না যাওয়াই ভালো। আপনার বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ অভিযোগ নেই। আপনার সি. আর. আমরা নষ্ট করছি না; অবশ্য যদি আপনি আদালতে যান তাহলে আমরা কি করব তা অবস্থা বুঝে ঠিক করা যাবে। আমি আশা করব আপনি ঐ ধরনের বিপজ্জনক ও ক্ষতির পথে যাবেন না। আপনার একটি ছোট্ট মেয়ে আছে, তার ভবিষ্যৎ আছে। আপনার

স্ত্রীও দেশহিতকর অনেক কাজ ক'রে যাচ্ছেন। পোস্টিং-এর অর্ডার আপনি কালই পেয়ে যাবেন। তিন দিনের মধ্যে আপনাকে নতুন পদে যোগ দিতে হবে। আচ্ছা, এবার আপনি আসতে পারেন।'

অপরাজিতা ধর বলল, 'উপায় কি? পোস্টিংটা নিয়ে নাও। তবু তো দিল্লী থাকা হবে।'

আমি বললাম, 'মধ্যপ্রদেশে ফিরে গেলে হয় না?'

অপরাজিতা ধর বলল, 'অসম্ভব। আমার অনেক কাজ। আমি কিছুতেই মধ্যপ্রদেশে যেতে পারব না।'

'যদি আমি একাই যাই?'

'আমরা থাকব কোথায়? নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কি হবে? তা ছাড়া মধ্যপ্রদেশের চীফ মিনিস্টর তোমাকে ফিরিয়ে নেবেন তারই ভরসা কোথায়?'

'যদি আদালতে যাই?'

'তাহলে ধনেপ্রাণে মরবে। তোমার নিজের ক্যারিয়ার তো গেছেই, আমার ক্যারিয়ারটাও নষ্ট করবে। নিবেদিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি কি একটুও ভাববে না?

নিবেদিতা ধর কাছেই ছিল। মাত্র বড় হ'তে শুরু করেছে। দেখতে সুন্দর হয়েছে নিবেদিতা ধর। ক্লাসে প্রথম হয়। আমি ওকে ঠিক চিনি না। আমার কাছে ঘেঁষে না নিবেদিতা। মার মেয়ে। তবু আমি ওর ভবিষ্যতের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

আমি আমার পড়ার ঘরে চলে গেলাম।

সেখানে ৺নীলাচল ধর আমার অপেক্ষা করছিল।

বললাম, 'তুমি কর্নেলিয়া নও, আমি নই কিং লীয়র। তবু, চল, আমরা দুজনে কারাগারে যাই।

Come, let's away to prison;

We two alone will sing like birds, i' th' cage;

When thou dost ask me blessing, I'll kneed down,

And ask of thee forgiveness, so we'll live,
And pray, and sing, and tell old tales and laugh
At gilded butterflies, and hear poor rogues
Talk of court news; and we'll talk with them too,
Who loses and who wins; who's in, who's out;
And take upon's the mystery of things,
As if we were God's spies: and we'll wear out,
In a wall'd prison, packs and sects of great ones
That ebb and flow by th' moon.

॥ দশ ॥

এ তুমি কোথায় এলে ?

কেন, কমরেড ? তোমার কষ্ট হবে থাকতে এখানে আমার সঙ্গে ?

এ কোন দেশ !

কেন ? চিনতে পারছ না ? এ দেশ তোমার, আমার।

দেশ, না কারাগার ?

ওরা আমাকে কারাগারে পাঠিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছ তুমিও। আমি জীবিত নীলাচল ধর। তুমি মৃত নীলাচল ধর।

তুমি কি করছ এখানে ?

আমি চ্যারিটেবল ট্রাস্টগুলিকে লালন-পালন করছি। গোটা ভারতবর্ষ এক বিরাট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। অ্যাণ্ড ইউ নো, চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ অ্যাট হোম ?

শুধু বিগিন্‌স্‌ নয়, চ্যারিটি এণ্ড্‌স্‌ অ্যাট হোম।

এ কারাগারের নাম ভারতবর্ষ। এখানে আমরা সব বন্দী।

তোমরা কারা ?

আমরা সারা স্বাধীন ভারতবর্ষকে গড়ে তুলেছি। শাসন করছি।

আমি তোমার সঙ্গে কেন?

তুমি ছাব্বিশ বছর বয়সে ম'রে গিয়েছিলে। তোমার শবদেহ বহন ক'রে চলেছিলাম আমি। তুমি আর আমি সেই থেকে একত্র চলছি।

চলছি?

না, চলছি না। আমরা একত্র আছি।

ওরা কারা? ঐ যে দাপাদাপি করছে, ওঁরা কারা?

ওরা ভারতবর্ষকে শাসন, শোষণ করছে। এখন ওরা নিজেদের মধ্যে লড়ছে।

কেন? ওরা তো ঐক্যবদ্ধ ছিল!

এখন আর নেই। ওদের সংখ্যা বেড়েছে। ওরা লুঠের মাল ভাগ ক'রে নিতে পারছে না। দস্যুরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে।

সাদা ঘোড়া ঝড়ের বেগে চালিয়ে চলছে কে?

ওদেরই মধ্যে একজন।

কোথায় যাচ্ছে?

দুর্গ দখলে।

দখল করে নিল যে!

নিতে দাও! রাখতে পারবে না।

কেন রাখতে পারবে না?

অন্যেরা কেড়ে নেবে দুর্গ।

তারা রাখতে পারবে?

এখন চলবে এই কাড়াকাড়ি।

আমরা কি করব?

আমরা দেখব।

শুধু দেখব?

আমরা ভয়ে কাঁপব, মুখ বুজে থাকব, তোষামোদ করব। আবার অন্য সময়ে; চেঁচাব, কুঁদব, পাঁয়তাড়া দেব।

তাতে কি হবে?

কিছু হবে না।

আমার মনে আছে, এখনও মনে আছে আমার।

কি মনে আছে?

মাধুরী ব'লে একটা মেয়ে ছিল।

আর?

তার চোখে ঘৃণা ছিল।

আর?

তার বাপ মারা পড়েছিল।

আর?

মাধুরী একদিন হারিয়ে গিয়েছিল।

তুমি?

আমি একদিন বিপ্লব করতে চেয়েছিলাম।

হয় না।

কি হয় না?

ভদ্রলোক দিয়ে বিপ্লব হয় না।

যাদের দিয়ে হয় তারা কোথায়?

তারা এখনও মহাভারতের মাঠে, জঙ্গলে। কুরুক্ষেত্রে এখন শাসকদের যুদ্ধ। দুই শিবির নয়। এ যুদ্ধের বাইরে, মাঠে জঙ্গলে বন্দরে বস্তিতে আর একটা সংঘাতের জন্যে মানুষ তৈরী হচ্ছে।

সে সংঘাত কবে?

আজ, আগামী কাল, আগামী অনেক কাল। এসো, এখন আমরা কারাগার থেকে দেখি, মঞ্চে কে এল, কে বিদায় নিল। এসো আমরা একসঙ্গে বৃদ্ধ হই, তরুণ আর প্রৌঢ় একসঙ্গে সেই বার্ধক্য নি, যার প্রশ্ন নেই, প্রবৃত্তি নেই, আছে শুধু নির্লিপ্ততা।

॥ এগারো ॥

কারাগার থেকে একদিন আমি মুক্তি পেয়ে গেলাম। খুব সহজ নিয়মে। আমার বার্ধক্য একটা বয়সকে স্পর্শ করল। তখন আর আমার কারাবাসের নিয়ম নেই। ওরা আমাকে ছেড়ে দিল। আমি কয়েকটি কাগজে সই করলাম। আর একজন বন্দী আমার সামনে দাঁড়াল। আমি তাকে দেখতে পেলাম না। সে আমাকে দেখতে পেল না। আমরা দুজনে করমর্দন করলাম। আমি চেয়ার খালি করে দিলাম। সে খালি চেয়ারে বসল। শাঁখ বাজল। উলুধ্বনি হল। চ্যারিটি চলল। আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

তখনও একটা বাজে নি। জুন মাসে দিল্লী পুড়ে যাচ্ছে রৌদ্রের প্রখর তাপে। আমার আঠার বছরের ঝরঝরে ফিয়াট গাড়িটা জ্বলন্ত ইস্পাত। দরজা খুলে বসতে গিয়ে শরীর জ্বলে গেল, চোখে ঝাপসা দেখলাম। সেই ঝাপসা দৃষ্টিতেই দেখতে পেলাম পাশের সীটে বসে আছে ৺ নীলাচল ধর।

তুমিও ছাড়া পেয়েছ, কমরেড ? বেশ! তাহলে চলো।

চলে এলাম অপরাজিতা ধরের ফ্ল্যাটে, পাণ্ডারা পার্কে। ফ্ল্যাট খালি। মালকান গেছেন নিজের দপ্তরে। নিবেদিতা স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতে তার সন্ধে হয়ে যায়।

সন্ধে পেরিয়ে যায় অপরাজিতা ধরেরও বাড়ি ফিরে আসতে। বাড়ি এসেও তিনি আফিসের কাজ নিয়ে বসতে বাধ্য হন। সমাজকল্যাণ কি সহজ ব্যাপার ?

আমি বসি, বই পড়ি, খাই, রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, ঘুমোই, দুঃস্বপ্ন দেখি, কাশি, হাই তুলি···

৺কমরেড নীলাচল ধর মরা চোখে আমাকে দেখে, দেখে, দেখে।

এমনি করে একটা পুরো মাস কেটে গেল। গোটা গোটা তিরিশটা দিন।

আমি অপরাজিতা ধরকে বললাম, 'এবার চলি।'

তিনি ফাইল থেকে মুখ তুলে বললেন, 'তার মানে?'

'তুমি অবসরপ্রাপ্ত, অসুস্থ, বৃদ্ধ।'

'অতএব চলি।'

'কোথায় চলবে?'

'দেখি কোনও কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারি কিনা।'

'সে তো এখানেই হতে পারে!'

'এখানে আর নয়। দিল্লীতে কাজ নেই।'

'কি আছে?'

'কুকাজ।'

'কাজ তাহলে কোথায় ব'সে আছে তোমার জন্যে।'

'সেটাই খুঁজে বার করতে হবে। কিছুদিনের ছুটি চাই। দরখাস্ত লিখে রেখেছি। এখন মঞ্জুর হ'লেই হল।'

অপরাজিতা ধর অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। বোধহয় ঠিক চিনতে পারলেন না। আমি একখানা কাগজ তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি কাগজখানা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে দপ ক'রে জ্বলে উঠলেন: 'বুড়ো বয়সে ন্যাকামি!' কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হল।

কমরেড, কোথায় যাবে?

৺নীলাচল ধর বলল, চলো কলকাতা।

কমরেড, এই সেই কলকাতা। ইংরেজ বণিক ও দেশী চামচাদের সম্পদলালসা জন্ম দিয়েছিল যে কলকাতাকে আজ তা সারা বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাজর্জর শহর। এই সে কলকাতা যার তিন ভাগ বস্তি, যার চৌচির পথ লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রথম ও শেষ আশ্রয়। তুমি চিনতে পারো তোমার তারুণ্যের, যৌবনের সেই শহরটাকে? যে শহর তোমাকে বিপ্লবী ক'রে তুলেছিল? আমি তো জন্ম থেকে এ শহর

থেকে পলাতক, এর সঙ্গে আমার পরিচয় পাঞ্জাবী মেয়ের পরিচ্ছদের উর্নির মতোই প্রায় অবান্তর। বছরের পর বছর আমি রয়ে গেছি সেই চক্রান্তের অংশীদার যা এই শহরটাকে জরা আর মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে, কেননা এই শহর, এই রাজ্য, শাসককুলের বিভীষিকা। ইংরেজ একে একই সঙ্গে ভালোবাসত, ঘৃণা করত, ভয় পেত। স্বাধীন ভারতের শাসককুল একে শুধু ভয় আর ঘৃণা করতে শিখেছে। এ শহরের দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের চিৎকার, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আগুন। এ শহর বিদ্রোহীর শহর, প্রতিবাদীর শহর, নালিশ-অভিযোগ-অভিমানের শহর, এ শহর প্রবঞ্চিতের, অপমানিতের, শোষিতের শহর। এ শহরের গলিতে গলিতে লক্ষ স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কোটি কোটি আশা আকাঙ্ক্ষা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এত স্বপ্ন, এত উত্তাপ, এত প্রেম, মানুষের মত বেঁচে থাকার এত আকাঙ্ক্ষা নেই ভারতবর্ষের অন্য কোনও শহরে। বিপরীত পথ ও মতের এই শহর। না-মানার, নত-না-হবার শপথ এই শহর। যে শাসককুলের সেবায় আমি জীবন কাটিয়ে দিয়েছি তারা পারেনি এই শহরটার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে। ক্ষুধা, বেকারী, দারিদ্র্য, অপমান, যন্ত্রণা, সব কিছু সত্ত্বেও এ শহরের চৌচির জনপথ এখনও প্রতিবাদী মানুষের পদক্ষেপে কাঁপছে।

কমরেড, তুমি অবাক হয়ে যাদের দেখছ তাদের নিয়ে এ শহর নয়। তুমি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছ আকাশভেদী দানবসৌধগুলির পানে, তুমি বুঝতে পারছ না, এ শহর কোনওদিন বোম্বাই অথবা দিল্লী হতে পারবে না। যারা মুখে আমূল পরিবর্তনের বুলি কপচিয়ে বাস্তবে সর্বভারতীয় কায়েমী স্বার্থকে পুষ্টি যোগায় তাদের ভবিষ্যৎ এ শহরে নির্মিত হতে পারবে না। এ শহর, কমরেড, সাধারণ মানুষের শহর। যারা কোনও মতে প্রাণটুকু হাতে করে ট্রামে বাসে শহর পাড়ি দেয়, খালি পায়ে হাঁটে, মাসের প্রথম সপ্তাহেই যাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শূন্য, এ শহর তাদের।

কলকাতা এসে অবধি আমি কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। ৬কমরেড নীলাচল ধর আমার নিত্য সহচর।

কাউকে চিনি না আমি এই শহরে। যারা ঐ উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর বাহারী ফ্লাটে বাস করে, তাদের চিনি না আমি। যারা পথে পথে ভিড় জমায়, যাদের গায়ের ঘাম ও শ্রান্ত নিশ্বাস এই শহরটাকে সর্বদা ক্লান্ত করে রাখে তারাও আমার অপরিচিত।

বালীগঞ্জের বাড়িতে এখন ভাড়াটে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিদায় নেবার পর মাননীয় বিচারপতি নীলমাধব ধর দেরাদুনে বানপ্রস্থ করছেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আমার বহুদিন কেটে গেছে।

আমি আস্তানা নিয়েছি মধ্য কলকাতার একটা সস্তা হোটেলে। আমার কোনও কাজ নেই। আমি শুধু পথে পথে চলি। ক্লান্ত হলে পার্কে বসি। মানুষ দেখি। অনেক কাল পরে আমি আবার মানুষ দেখতে শিখছি। বহু বছর দেখিনি মানুষকে, দেখেছি তাদের ছায়া, দেখেছি পরিসংখান। 'শতকরা চুয়ান্নজন ভারতবাসী দারিদ্র্য-রেখার নিচে বাস করে।' তারা মানুষ নয়। শুধু পরিসংখ্যান। পিপীলিকা।

কি আশ্চর্য! এত বছর পরে মানুষ আমাকে টানছে, ইশারা দিচ্ছে, এসো, আমাদের সঙ্গে এসো।

আমি ভয় পাচ্ছি। বুকের স্পন্দন রুদ্ধ হয়ে আসছে। শরীরে শিহরণ! আমার রক্তের গতি দ্রুত হয়ে উঠেছে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি এলগিন রোড আর চৌরঙ্গীর মোড়ে। হাজার হাজার মানুষ চলছে, চলছে। মানুষের শেষহীন মিছিল। হাতে হাতে দাবিমুখর প্রতিবাদমুখর প্ল্যাকার্ড। এরা কারা? এরা তো শহুরে মানুষ নয়। এরা এসেছে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। জিলা মহকুমা-ব্লক থেকে। গ্রামের মানুষ অভিযানে এসেছে শহরে।

আমি দেখেছিলাম। হঠাৎ সেই ছাব্বিশ বছরে মরে যাওয়া নীলাচল ধর এক ঠেলা দিয়ে আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দিল। বলল, নেমো পড়ো। রাস্তায় নামো। মানুষের সঙ্গে মিশে যাও।

মানুষের মিছিল কি আমাকে মুক্তি দেবে আমার নির্লিপ্ততার কারাগার থেকে?

এ প্রশ্ন পরে। এখন শুধু পথ আর মানুষ আর দাবি আর প্রতিবাদ। এখন শুধু পদক্ষেপ।

॥ বারো ॥

ঐ লোকটার মিছিলে মিশে যাবার কথা নয়, তবু সে মিশে গেল। মিছিল দেখতে আমার এখনও ভালো লাগে, আমি এককালে মানুষের মিছিল আর সমাবেশ আর হুঙ্কার নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, এখনও লিখি, লিখতে চেষ্টা করি, কিন্তু মিছিল আর মানুষ এখন অন্যপথে মোড় নিয়ে চলে যায়, আমি দাঁড়িয়ে থাকি সড়কের ওপর, মিছিল আর আমি কি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি ? মানুষ আর আমি ?

দুটি ক্ষয়িত পুরুষের কাহিনী লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু লিখে উঠতে পারলাম না। নীলাচল ধর কলম ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কাহিনী নিজেই লিখল। আমি আমার কাহিনী লিখতে গিয়েও লিখে উঠতে পারলাম না। মানুষ আর মিছিল আমার কাছ থেকে আমাকে আড়াল করে দিয়েছে। আমাকে এখন আর আমি চিনতে পারছি না।

অতীত, অনেক পুরনো অতীত আমাকেও ধাক্কা দিয়ে মিছিল ও মানুষের সঙ্গে মেশাতে চেয়েছিল, কিন্তু—

কিন্তু এলগিন রোডের ওপর পার্ক করা আছে আমার গাড়ি, যাকে নজরের আড়াল করতে এখন আমার ভয়, এবং ভুলতে কি পারি, কালই আমাকে চলে যেতে হবে বাগদাদ, যেখানে এশিয়া আফ্রিকার কবি ও শিল্পীরা একসঙ্গে হ'য়ে রোডেশিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে অভিনন্দন করবে ? কবিতা পাঠ করতে হবে না আমাকে বাগদাদে, বুদাপেস্টে, ব্রাহায়, বলশয় নাট্যশালায় ?

॥ শেষ ॥